

নারায়ণ সান্যাল

শালক হেবো



শার্লক হেবো

উৎসର୍ଗ

সদ্যপ্রয়াত অধ্যাপক
নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়কে

প্রথম প্রকাশ : 1971

গুরুবিদায় পর্ব

শার্লক হেবোর পরিচয় দিয়ে এই কাহিনী শুরু করতে হল বলে আমার নিজেরই কেমন লজ্জা করছে। কিন্তু উপায় কী? এখনও যে হেবো যথেষ্ট বড় হয়নি। তাই তোমরা তাকে চেন না কেউ। বছর-দশেক পরে যে হেবোর সামনে অটোগ্রাফ খাতাখানা মেলে ধরে তোমাদের সবাইকে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকতে হবে—সেই হেবোরই পরিচয় দিতে হচ্ছে আজ তোমাদের কাছে।

হেবো জন্ম-ডিকেটটিভ। বাংলার ভবিষ্যৎ শার্লক হোমস্। হেবোকে না চিনলেও শার্লক হোমস্কে নিশ্চয় চেন তোমরা। স্যার আর্থার কনান ডয়েলের অমর সৃষ্টি গোয়েন্দা-কুল-তিলক শার্লক হোমসের কাহিনী দুনিয়াসুদ্ধ লোক জানে। হেবোর কাকা মাসিক পত্রিকায় মাঝে মাঝে ডিটেক্টিভ গল্প লেখেন, তাছাড়া ওর মেসোমশাই অজিতেন্দ্রবাবু পুলিশের একজন বড় অফিসার। সুতরাং ছেলেবেলা থেকে চোর-ডাকাতের কথা শুনে শুনে তাদের ধরনধারণ ভালই জানা ছিল হেবোর। এ ছাড়া ওর মেজদা লাইব্রেরি থেকে লুকিয়ে ডিটেক্টিভ বই নিয়ে এসে বাবা-মা-কাকাদের চোখ এড়িয়ে পড়ার টেবিলেই উপক্রমণিকা আড়াল দিয়ে গোথাসে গিলত। বড়রা কেউ টের পেতেন না, এমনভাবে লুকিয়ে রাখত সে বইগুলো; কখনও পুরোনো খবরের কাগজের স্থপের নিচে, কখনও আলমারির পেছনে, কখনও বা রান্নাঘরের কুলুঙ্গিতে, আচারের শিশিগুলোর পেছনে। হেবো আবার মেজদার নজর এড়িয়ে সেগুলো যথাযথিত হস্তগত করত, আর একের পর এক শেষ করে ফেলত। অসংখ্য গোয়েন্দা-গল্প পড়ে পড়ে চোর-ধরা ব্যাপারটা তার কাছে জলবৎ তরলং হয়ে গিয়েছে।

মাথাটা হেবোর এমনিতেই বেশ সাফা। হেডমাস্টারমশাই বলেন, মন দিয়ে পড়লে ও নিশ্চয়ই ক্লাসে ফার্স্ট হত। কিন্তু হেবোকে গোয়েন্দাগিরির ভূতে পেয়েছে—পাস করার জন্য যেটুকু দরকার শুধু সেইটুকু সম্পর্ক সে বজায় রেখেছে পড়ার বইয়ের সঙ্গে। বাকি সময় সে মেতে থাকে তার গোয়েন্দাগিরির মালমশলা নিয়ে। ডিটেক্টিভ-সুলভ সবকটা গুণই আছে তার : তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণ শক্তি, অনুসন্ধিৎসা, সূক্ষ্ম যুক্তির বিশ্লেষণ, ইনটুইশন, সাহস আর ধৈর্য। এ কাজের যাবতীয় সরঞ্জাম সে একে একে সংগ্রহ করেছে। নোটবই, ডায়রি, মেজদির সেলাইয়ের বাস্ক থেকে উদ্ধার-করা একটা ছেঁড়া মাপবার ফিতে, দাদুর বাতিল চশমার পুরু একটা লেন্স। নোটবইতে সময়ে অসময়ে হেবো অনেক কিছু টুকে রাখে। কোন সমস্যার ক্লু কখন কোথায় দরকার হবে তা কি কেউ আগে থেকে বলতে পারে? মেজদা ওর চেয়ে দু বছরের বড়—‘শার্লক হেবো’ নামটা সেই দিয়েছে ঠাট্টা করে; পদে পদে সে চায় হেবোকে অপদস্থ করতে। নোটবইয়ের কথা উঠলে মেজদা বলে—হেবোর নোটবইতে সব খবরই লেখা আছে, শুধু লেখা নেই—‘পাগলা ষাঁড়ে করলে তাড়া কেমন করে ঠেকাব তায়।’

হেবো রাগ করে না। বিজ্ঞের মতো হাসে শুধু।

মেজদা না মানলেও, হেবো যে সত্যিকারের একজন ক্ষুদ্রে গোয়েন্দা, তার প্রমাণ সে দিয়েছিল। পর-পর দু-তিনটি রহস্যের কিনারা সে করে ফেলেছিল তার কিশোর বয়সের বুদ্ধিতে। তোমরা হয়ত খবর রাখ, নয় তো রাখ না। তা, তোমরা না জানলেও হেবোর বাড়ির এবং পাড়ার লোকেরা মেনে নিয়েছিল, হেবো একটি হবু-গোয়েন্দা। পলাশপুরে হেবোর দাদু একবার রীতিমতো এক ষড়যন্ত্রের রহস্যজালে মারা পড়তে বসেছিলেন; ব্যাপারটা এতই যোরালো হয়ে ওঠে যে শেষ পর্যন্ত হেবোর মেসোমশাই অজিতেন্দ্রবাবু একজন প্রফেশনাল গোয়েন্দাকে নিয়োগ করেছিলেন। হেবো তাঁকে প্রবীরকাকু বলে ডাকত। হেবো আর তার প্রবীরকাকু মিলে সে রহস্যের কিনারা করেছিল। মোট কথা সেই থেকে প্রবীরবাবু হেবোকে মোটামুটি শ্রদ্ধার চোখেই দেখতেন, যদিও হেবো মাত্র পনের বছরের কিশোর,—ক্লাস টেন-এ পড়ে।

পলাশপুরের রহস্যটা সমাধান হওয়ার পর কোথায় হেবো বাবা খুশি হবেন তা নয়, তিনি কড়া হুকুম জারি করেছিলেন—গোয়েন্দাগিরি হেবোকে একেবারে ছেড়ে দিতে হবে, যতদিন না সে হায়ার সেকেন্ডারি পাশ করে। বাধ্য হয়ে হেবো তার গোয়েন্দাগিরির সাজ-সরঞ্জাম তুলে রেখে পড়াশোনায় মন দিয়েছিল।

* * *

কিন্তু ভবিষ্যতে যাকে শার্লক হোমসের মতো বড় গোয়েন্দা হতে হবে, তার কপালে শুধু পড়া মুখস্ত করার ব্যাপারটা কেন লিখবেন ভগবান? মাসকতক পরে আবার একদিন হেবোকে ডেকে পাঠালেন তার কাকা। হেবো ভেবেছিল, আবার বুঝি এক প্রস্থ উপদেশ বর্ষিত হবে তার ওপর। উপায় নেই, এখন মাঝে-মাঝেই তাকে ডেকে কাঁকা নানান উপদেশ দেন—খোঁজখবর নেন, সে গোয়েন্দাগিরি ছেড়েছে কি না। বই-বন্ধ করে হেবো এসে হাজিরা দেয় কাকার ঘরে। কাকা সম্মেহে ডেকে বলেন—‘আয় বোস।’

সূরটা যেন অন্যরকম লাগছে? মুখ তুলে হেবো দেখতে পায়—ঘরে বসে আছেন কাকা, কাকীমা আর সেই পলাশপুরের প্রবীরকাকু। প্রবীরকাকু বলেন, ‘কেমন আছ হেবো?’

হেবো হাসে, জবাব দেয় না।

কাকা বলেন, ‘তোকে একটি জরুরী কাজে ডেকেছি হেবো। মানে আমরা একটা বিপদে পড়েছি। কী করব স্থির করে উঠতে পারছি না। তোর তো এসব বিষয়ে বেশ বুদ্ধি খোলে, তাই—’

হঠাৎ থেমে পড়েন কাকাবাবু। হেবো মনে মনে উৎফুল্ল হলেও মুখে সে-ভাব প্রকাশ করে না।

প্রবীরবাবু আলোচনার সূত্রটা তুলে নিয়ে বলতে থাকেন, ‘সত্যি করে বলতে কি, তোমার কাকিমা এ কাজে আমার সাহায্য চেয়েছেন। ব্যাপারটা জটিল; কিন্তু আমি বলেছি, আমার সহকারী হিসাবে যদি শ্রীমান শার্লক হেবো কাজ করে তবেই এ দায়িত্বটা নিতে পারি।’

হেবো একটু অবাক হয়ে বলে, ‘কাকিমা? তোমার বিপদ?’ প্রবীরকাকু ব্যাপারটা পরিষ্কার করে দিয়ে বলেন, ‘না, বিপদটা ঠিক তোমার কাকিমার নয়—তাঁর ছোট বোন মঞ্জুলা দেবীর। ব্যাপারটা এই—’

আদ্যোপান্ত ঘটনাটা হেবো মন দিয়ে শোনে।

হেবোর কাকিমারা দুই বোন। কাকিমার ছোট বোন মঞ্জুলা দেবীর বিয়ে হয়েছিল কৃষ্ণনগরের একজন নামকরা উকিল সুধাকান্তবাবুর একমাত্র ছেলে নির্মলেন্দুর সঙ্গে। সুধাকান্তের অন্য সন্তানাদি নেই। স্ত্রীও দীর্ঘদিন গত। কৃষ্ণনগরের রায়পাড়ায় মস্ত বড় বাড়ি। যুগ্মষ্ট রোজগার করেছেন জীবনে। এখন অবসরপ্রাপ্ত মানুষ। সন্তরের ওপর বয়স। ছেলে নির্মলেন্দুই ছিল তাঁর জীবনের একমাত্র অবলম্বন। শেষ বয়সে তন্ত্র-সাধনার দিকে ঝোঁকটা হয়েছে বৃদ্ধের। শাস্ত্র-মন্ত্রে দীক্ষা নিয়েছেন, পূজা-অর্চনাতেই দিন কাটে। নির্মলেন্দুর সঙ্গে মঞ্জুলার বিয়ে হয়েছিল বছর-পাঁচেক আগে। নির্মলেন্দু ছিল দক্ষিণ রেলওয়ের একজন অফিসার। ফলে বিয়ের পর থেকেই মঞ্জুলা বরাবর স্বামীর সঙ্গে দাক্ষিণাত্যের এখানে-ওখানে ঘুরছে। শ্বশুরমশায়ের সঙ্গে তার বিশেষ ঘনিষ্ঠতা হবার সুযোগ হয়নি। ছুটিছাটায় নির্মলেন্দু যখন বাড়ি এসেছে তখন মঞ্জুলাও এসেছে, এবং সুধাকান্তের সেবায়ত্বের কোনো ক্রটি করেনি। বিয়ের মাসখানেক আগেই নির্মলেন্দু চাকুরিতে ঢুকেছিল, আর বিয়ের মাসদুয়েক পরেই সে বদলি হয়ে যায় মাদ্রাজে। ফলে মঞ্জুলার পক্ষে শ্বশুরের ঘর করাটা ঘটেনি।

এখন মজা হচ্ছে এই যে, সুধাকান্তবাবুর ধারণা হল, এই অপয়া বউয়ের জন্যই নির্মলেন্দু তার বাপকে ত্যাগ করে গেল। এ ধারণার পেছনে কোনো যুক্তি নেই। সুধাকান্তবাবু একজন নামকরা উকিল ছিলেন, যুক্তির ওপর নির্ভর করে কত বড় বড় কেস জিতেছেন তিনি; অথচ এখন একেবারে বিনা যুক্তিতে ছেলেমানুষের মতো তিনি অভিমান করে রইলেন পুত্রবধূর ওপর। বেচারি মঞ্জুলা এ অভিমান ভাঙাবার নানান চেষ্টা করেছে। স্বামীকে ছেড়ে কৃষ্ণনগরে শ্বশুরের কাছে এসে থাকতে চেয়েছে; কিন্তু ততোও কোনো ফল হয়নি। সুধাকান্ত তো পুত্রবধূর সেবার জন্য কাতর নন, তিনি চাইছেন পুত্রের সান্নিধ্য। অথচ সে বেচারি চাকরি ছেড়ে বারে বারে এতদূর আসেই বা কী করে? শেষ পর্যন্ত নির্মলেন্দু

বলেছিল, ‘বাবা, আপনিই কেন আমার ওখানে গিয়ে থাকবেন চলুন না, মাদ্রাজে!’ কিন্তু তাতেও সুধাকান্ত রাজি নন। দেশ-ঘর ছেড়ে অত দূরে এই বয়সে তিনি যাবেন না। ফলে পিতা, পুত্র আর পুত্রবধূর মধ্যে একটা মন-কষাকষির সূত্রপাত হল।

হেবো বাধা দিয়ে বলে, ‘কিন্তু এর মধ্যে কাকিমার বিপদটা কোথায়?’

প্রবীরবাবু বলেন, ‘বলছি, সবটা শোন আগে।’

ঘটনার গতিটা কোন দিকে মোড় নিয়েছে এবার তিনি তা বুঝিয়ে দেন।

মাসচারেক আগে হঠাৎ একটা আকস্মিক দুর্ঘটনায় নির্মলেন্দু মারা গিয়েছেন। এ আঘাতে সুধাকান্ত একেবারে ভেঙে পড়েছেন। তিনি যেন একেবারে অন্য মানুষ হয়ে গিয়েছেন। অথচ তাঁর মাথা খারাপের কোনো লক্ষণ দেখা যায়নি। মানসিক স্বৈর্য তাঁর ঠিকই বজায় আছে। তবে, সমস্ত দুনিয়ার ওপর তাঁর একটা বিতৃষ্ণা জন্মেছে। সুধাকান্তের অর্থের অভাব ছিল না—যথেষ্ট টাকা উপার্জন করেছেন তিনি সারা জীবনে। তবু সেই টাকা রোজগারের অছিলাতেই ছেলে যে বাপকে ত্যাগ করে গিয়েছিল এটা তিনি ভুলতে পারেননি। ছেলে নেই—টাকার ওপরেই মর্মান্তিক চটে গিয়েছেন তিনি। তাঁর ধারণা হয়েছে অর্থই সকল অনর্থের মূল। আর চটে গিয়েছেন তাঁর পুত্রবধূর ওপর। আগে থেকেই অবশ্য চটে ছিলেন, পুত্রের মৃত্যুর পর সেটা মর্মান্তিক আকার ধারণ করেছে।

মঞ্জুলার একটি সন্তান হয়েছিল ইতিমধ্যে। বছরখানেকের ছেলেটিকে নিয়ে সে এসে আশ্রয় চাইল শ্বশুরের ভিটায়। আশ্রয় তিনি দিলেন, অন্নবস্ত্রের ব্যবস্থাও করতে তিনি রাজি; কিন্তু না পুত্রবধূ না তার অবোধ শিশুসন্তান—কাউকেই তিনি মনে-প্রাণে গ্রহণ করলেন না।

দোতলা বাড়ি। ওপর তলায় তিনখানি ঘর। একটি ঘরে থাকেন সুধাকান্তবাবু, দ্বিতীয় ঘরটি তালাবন্ধ থাকে। সেটায় ছাত্রজীবনে নির্মলেন্দু থাকত। কখনও-সখনও দেশে এলে সস্ত্রীক এই ঘরেই উঠত সে। তৃতীয় ঘরখানিতে বর্তমানে আছেন সুধাকান্তের গুরুদেব। মন্ত্রদীক্ষা দিতে তিনি এসেছিলেন একদিন, আর ফিরে যাওয়া হয়নি। একতলায় রান্না, ভাঁড়ার, বৈঠকখানা ছাড়াও আর একটি বাড়তি ঘর ছিল। সেটাতেই থাকতে দেওয়া হয়েছিল মঞ্জুলাকে। ঘরটা অন্ধকার, স্যাঁতসেঁতে। এমন একখানা ঘরে তাকে থাকতে দেওয়ার সঙ্গত কারণ দেখিয়েছিলেন গুরুদেব। সুধাকান্ত নাকি পুত্রবধূর বৈধব্যের বেশটা সহ্য করতে পারেন না। না পারাই স্বাভাবিক। মাত্র পাঁচ বছর আগে যাকে আদর করে নিয়ে এসেছিলেন এ বাড়ির লক্ষ্মী করে, সে-ই যদি আজ সাদা থান পরে তাঁর সামনে ঘুরে বেড়ায় তাহলে তাঁর কষ্ট হয় বইকি। মঞ্জুলাও তাই মেনে নিল এই দুর্ভাগ্যকে। একতলার ঐ অন্ধ কুঠুরিতেই আশ্রয় নিল সে শিশুসন্তানটিকে নিয়ে। বাড়িতে দারোয়ান, ঠাকুর আর পুরনো আমলের ঝি মোক্ষদামাসি আছে। তারাই সব কাজকর্ম সারে। গুরুদেব প্রথম দিনেই বলে দিয়েছিলেন, এ বেশে মঞ্জুলা যেন তার শ্বশুরের সামনে না যায়।

প্রথমটায় লজ্জায়, সঙ্কোচে আর হতাশায় মাথা নিচু করে এ আদেশ মেনে নিয়েছিল মঞ্জুলা। সুধাকান্তের পুত্রবিয়োগের জন্য যেন সেই দায়ী। সত্যিই তো, এ বেশে সে কেমন করে গিয়ে দাঁড়াবে তাঁর সামনে? কিন্তু দু-দশদিন পরে তার খেয়াল হল—কিন্তু এ তো হতে পারে না! এই বেশ বদলাবার কোনো সম্ভাবনা যখন নেই তখন সে কি চিরকালই ঐ অন্ধ কুঠুরিতে পড়ে থাকবে নাকি? শ্বশুরের সেবায়ত্ত্ব করবে না?

গুরুদেব কঠিন হয়ে বললেন, ‘না! এতদিন যদি পুত্রবধূর সেবায়ত্ত্ব ছাড়াই চলে গিয়ে থাকে, তবে আর কটা দিনও চলবে!’

বাধ্য হয়ে এই অপমানকর জীবনযাত্রাকে স্বীকার করে নিয়েছিল মঞ্জুলা। নির্বাক্তব পুরীর একতলার ঐ অন্ধকার ঘরে ইঁদুর আর আরশোলা ভাড়িয়ে পড়ে ছিল কোনোক্রমে। সদাবিধবার যেন নতুন কোনো কষ্টের বোধই ছিল না। তবু তার মনে একটি আশার বীজ সে সযত্নে বাঁচিয়ে রেখেছিল—একদিন না একদিন সুধাকান্ত তাকে ক্ষমা করে কাছে টেনে নেবেন। কতদিন আর অভিমান করে থাকতে পারবেন তিনি? সুধাকান্ত কি কোনোদিনই বুঝবেন না—যে-দুঃখের আগুনে তিনি জ্বলে-পুড়ে মরছেন সেই একই আগুনে জ্বলছে এ বাড়ির আর একটি উপেক্ষিতা বধূ? তাকে না হলেও অত্যন্ত নির্মলেন্দুর সন্তানটিকে, ফুলের মতো সুন্দর বংশের শেষ প্রদীপটিকে, একদিন তিনি তাঁর পাঁজর-সর্বস্ব

হাহা-করা বুকে টেনে নেবেনই। খোকন নতুন হাঁটতে শিখেছে। টলমল করে সারা বাড়ি টলে টলে বেড়ায়। সিঁড়ি বেয়ে উঠতে চায় দোতলায়।

কিন্তু তা হবার নয়। গুরুদেব আর তাঁর চেলাটি পালা করে পাহারা দেয় সুধাকান্তের ঘরের সামনে। ওঁদের ভয়ে খোকনকে ওপরে নিয়ে যেতে পারে না কেউ। ক্রমে মঞ্জুলার আশা নিরাশায় পরিণত হয়েছে, আর সে অনুভব করছে যে শ্বশুরের সঙ্গে পুনর্মিলনের পথে একমাত্র বাধা ঐ গুরুদেবটি।

কিন্তু কেন? মঞ্জুলা কোনো কারণ খুঁজে পায়নি।

মঞ্জুলার বাপের বাড়ির অবস্থা বিশেষ ভাল নয়। ভাই নেই তার। বাবা গত হয়েছেন। মা আছেন মালদায়—জমিজমা থেকে কোনোক্রমে দিন চলে যায় তাঁর। একই দিদি—তিনিই হেবোর কাকিমা। হেবোর কাকা অবশ্য মঞ্জুলাকে তাদের বাড়িতে এনে রাখতে পারতেন; কিন্তু তাহলে শ্বশুরের বিষয়-সম্পত্তি কিছুই সে পাবে না। ছেলেটিকেও তো মানুষ করে তুলতে হবে।

* * *

মঞ্জুলার চিঠি পেয়ে হেবোর কাকা আর কাকিমা কৃষ্ণনগরে গিয়েছিলেন। কিন্তু সুধাকান্তবাবু তাঁদের কোনো আমলই দেননি। প্রথমত তিনি দেখাই করতে চাননি, বলে পাঠিয়েছিলেন—‘আপনারা বৌমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন। তিনি নিচের তলায় আছেন।’ কিন্তু হেবোর কাকা নাছোড়বান্দা হয়ে দেখা করেছেন তাঁর সঙ্গে। সুধাকান্তবাবু ভালভাবে ওঁদের সঙ্গে কথাই বলেননি। তবু নকুলবাবুর মধ্যস্থতায় মোটামুটি সাক্ষাৎটা হয়েছে।

বাধা দিয়ে হেবো বলে, ‘নকুলবাবুটি কে?’

হেবোর কাকিমা বলেন, ‘নকুলবাবু তায়ইমশায়ের পুরানো মুহুরি। বলতে গেলে ওঁদের সংসারেরই একজন। তাঁরও সন্তরের কাছাকাছি বয়স। তিনি নির্মলেন্দুকে কোলে-পিঠে করে মানুষ করেছেন। নির্মলেন্দুকে তিনিও খুব ভালবাসতেন। সেই নির্বাকব পুরীতে ঐ নকুলচন্দ্রই মঞ্জুলার একমাত্র ভরসা। খোকনের মধ্যে তিনি নির্মলকে যেন নতুন করে আবিষ্কার করেছেন।’

হেবো বলে, ‘যাই হোক, তারপর?’

হেবোর কাকা বলেন, ‘আসল সমস্যা হচ্ছে এই যে, আমরা জানি না সুধাকান্তবাবু কোনো উইল করে রেখেছেন কিনা। করলেও হয়ত তিনি নির্মলের নামে সবকিছু লিখে দিয়ে গিয়েছেন।’

বাধা দিয়ে হেবো আবার বলে, ‘আমি আইনের ব্যাপারটা ঠিক জানি না। যদি তাই করে থাকেন, তাহলে নির্মলবাবুর মৃত্যুর পর তাঁর স্ত্রী-পুত্রই কি সে সম্পত্তি পাবে না?’

‘হ্যাঁ, তাই পাবে।’ বলেন প্রবীরবাবু, ‘কিন্তু তোমার কাকা আশঙ্কা করছেন যে, ঐ গুরুদেবের পরামর্শে সুধাকান্তবাবু নতুন করে উইল করতে চাইছেন। আর সেই নতুন উইলে তিনি মঞ্জুলা দেবীকে আর তাঁর নাবালক সন্তানকে সম্পূর্ণ বঞ্চিত করতে চান।’

হেবো বলে, ‘এ তো খুব সর্বনাশের কথা! এ কথা কি আপনারদের অনুমান, না প্রমাণ আছে কিছু?’

প্রবীরবাবু বলেন, ‘এটা এখনও অনুমানের পর্যায়েই আছে বটে তবে অনুমানের সপক্ষে যথেষ্ট জোরাল যুক্তিও আছে। খবরটা দিয়েছেন নকুলচন্দ্র।’

সে কাহিনীও বিস্তারিত শুনল হেবো।

সুধাকান্তবাবুকে এই পুরাতন ভক্তটি আজও অত্যন্ত শ্রদ্ধা করে। নকুলচন্দ্র ছিলেন তাঁর মুহুরি। সুধাকান্তের ছত্রচ্ছায়ায় থেকে দু-হাতে পয়সা কামিয়েছেন—ছেলেদের মানুষ করেছেন, মেয়েদের পাত্রস্থ করেছেন। দু-জনেই অবসর নিয়েছেন বটে, তবু আজও নকুলচন্দ্র প্রতিদিন আসেন তাঁর ‘বড়বাবু’কে দেখতে। সংসারের খবরাখবর নিয়ে, পুরোনো দিনের কথা দুটো-চারটে আলোচনা করে, রাত বাড়লে বাড়ি ফিরতেন। সুধাকান্ত কোন কেসে কেমন করে সওয়াল করেছিলেন, কোন আসামীকে ফাঁসির দড়ির নিশ্চিত আলিঙ্গন থেকে মুক্ত করেছিলেন, কোন ধড়িবাজ বদমায়েসের কুট কৌশল ব্যর্থ করে তাকে কারাক্ষের দিকে ঠেলে দিয়েছিলেন—বলতে বলতে উজ্জ্বল হয়ে উঠতেন নকুলচন্দ্র। আর মনে মনে খুব উপভোগ করলেও সুধাকান্ত বলতেন, ‘আরে ছেড়ে দাও নকুল! ওসব কথা থাক, সে রামও নেই, সে অযোধ্যাও নেই। আমাদের সময় হাকিমরা ছিল সত্যিকারের মানুষ। সেই ম্যাকফারলন সাহেবকে মনে আছে তোমার?’

নকুল বলতেন, ‘মনে নেই আবার? ফেয়ারওয়েলের দিন তিনিই না আপনাকে বলেছিলেন, এখান থেকে যেতে আর কোনো দুঃখ নেই, শুধু একটা দুঃখ, তোমার মতো উকিলের জোরাল সওয়াল আর শুনতে পাব না।’

বাধা দিয়ে সুধাকান্ত বলতেন, ‘আরে ছেড়ে দাও নকুল! ওসব কথায় আর কাজ কী?’

এই দুটি প্রাচীন বন্ধুর সামাজিক মর্যাদার আসন উঁচু-নিচু কি না বুঝবার উপায় ছিল না। ওঁদের বন্ধুত্বে ভাটার টান পড়ল সুধাকান্ত দীক্ষা নেবার পর থেকে। গুরুদেব নকুলচন্দ্রকে পছন্দ করতেন না। ওঁদের সাক্ষ্য আসরে প্রায়ই এসে বসতেন তিনি। আর দু-জনেই কেমন যেন আড়ষ্ট হয়ে উঠতেন। ক্রমশ নকুলচন্দ্র অনুভব করেন, তিনি এ বাড়ির কর্তার কাছে অবাস্তিত। তবু দীর্ঘ পঞ্চাশ বছরের অভ্যাসবশত সন্ধ্যাবেলায় একবার দেখা দিয়ে যেতেন।

কিছুদিন আগে সুধাকান্তের হঠাৎ খুব জ্বর হয়। নকুলচন্দ্র তৎক্ষণাৎ খবর পাঠালেন শহরের নামকরা ডাক্তার অনুকূলবাবুকে। অনুকূলচন্দ্র বয়সে ছোট, কিন্তু পসার খুব আছে তাঁর। ঔষধপত্র পড়তে সামলে নিলেন সুধাকান্ত; কিন্তু দুর্বল হয়ে পড়লেন তিনি। দিনসাতেক জ্বর ভোগ করেই একেবারে কাবু হয়ে পড়লেন। বিছানা থেকে নামতে পারেন না। হার্টের অবস্থা ভাল নয়। শয্যাশায়ী হয়ে পড়লেন সুধাকান্ত। নকুলচন্দ্র সকাল-বিকেল দু-বেলা আসতে শুরু করলেন, খবর নিতে—ব্যবস্থা-পত্র করতে। বয়স হলে কী হবে, নকুলচন্দ্র এখনও বেশ শক্ত আছেন। দোতলায় উঠে গিয়ে তিনি তাঁর বড়বাবুর সঙ্গে রোজ দেখা করেন। সেদিনও গিয়ে যেই বসেছেন, সুধাকান্ত বললেন, ‘নকুল, ঐ লোহার সিন্দুকটা খুলে ডানদিকের ওপরের খোপে একটা বন্ধ খাম আছে, বার করে দাও তো।’

দেওয়ালের সঙ্গে গাঁথা লোহার মজবুত আলমারি। তার চাবিটা সর্বক্ষণ থাকে অসুস্থ সুধাকান্তের বালিশের নিচে। চাবিটা বার করে তিনি নকুলচন্দ্রের হাতে দিলেন। ওঁর চোখের সামনেই ঘটছে সব কিছু। নকুলচন্দ্র চাবি খুলে ওপরের খোপ থেকে একটা সীলমোহর করা খাম বার করে ফিরে এলেন। খাম ও চাবিটা বড়বাবুর হাতে দিতে সুধাকান্ত বললেন, ‘সিন্দুকটা আবার খোলা রেখে এলে কেন? ওটা বন্ধ করে চাবিটা দাও আমাকে।’

নকুলচন্দ্র বললেন, ‘আমি ভেবেছিলাম, খামটা আবার তুলে রাখতে হবে।’

—‘না, ওটা এখন বাইরেই থাকবে।’

খামটা বালিশের নিচে রাখলেন সুধাকান্ত।

সিন্দুক বন্ধ করে নকুলচন্দ্র চাবিটা তাঁর হাতে ফিরিয়ে দেবার সময় আর আত্মসংবরণ করতে পারেন না, বলে ফেলেন, ‘কিন্তু এটা কি ভাল হচ্ছে বড়বাবু?’

সমকে উঠে সুধাকান্ত বললেন, ‘কোনটা নকুল?’

—‘আমি তো স্যার জানি কী আছে ঐ সীলমোহর করা খামের ভিতরে! বছর দশেক আগে ওটা আমিই তো আপনার সামনে সীলমোহর করেছিলাম। সাক্ষী হিসাবে আমারও সই আছে কাগজটায়।’

সুধাকান্ত কোনো জবাব দিলেন না। গুম মেরে বসে রইলেন। কিন্তু নকুলচন্দ্র পাকা লোক। সাক্ষী নীরব থাকলে তাকে ছেড়ে দিতে নেই, আরও ভাল করে চেপে ধরতে হয়—দীর্ঘদিনের কোর্ট-কাছারির অভিজ্ঞতায় এটুকু জানা ছিল তাঁর। তাই হেসে বলেন, ‘আপনি আমার কথার জবাব দিলেন না কিন্তু বড়বাবু।’

সুধাকান্ত ধমকে ওঠেন, ‘উইল পালটাব কিনা তাও কি তোমার সঙ্গে পরামর্শ করতে হবে নাকি?’

নকুল হান হাসেন। অনেক দুঃখের সে হাসি। বলেন, ‘আজ্ঞে না। আপনি মস্ত বড় উকিল, আর আমি সামান্য মুহুরি। আপনারই অগ্রে পালিত বলতে পারেন। আমার মতো লোকের সঙ্গে আপনি কেন এসব বৈষয়িক ব্যাপারে পরামর্শ করবেন? তবে কিনা নিমুকে একদিন কোলেপিঠে করে মানুষ করেছিলাম—তাই তার ঐ বাচ্চাটার কথা ভেবে—কিন্তু নাঃ! আমার অন্যান্যই হয়েছে।’

পাথরের মূর্তির মতো স্থির হয়ে বসে থাকেন সুধাকান্ত।

নকুল একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলেন, ‘আর মুশকিল হয়েছে কি জানেন বড়বাবু—আপনি তো চোখে দেখেন না, ওদের ওপরেই আসতে দেন না; কিন্তু আমি তো দেখতে পাই, খোকনবাবু সারা বাড়িটা টলমল করে হেঁটে বেড়ায়। ঠিক নিমুর মতো দুষ্ট হয়েছে—মায় হাসিটা পর্যন্ত। তাই ঐ ছেলেটির

ভবিষ্যৎ ভেবে...কিন্তু আবার পাগলামি করছি আমি। এ সব কথা আলোচনা করার আমার অধিকারই যে নেই! হ্যাঁ, অন্যায়ই হয়েছে আমার, মাপ করবেন আমাকে।’

চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ান নকুলচন্দ্র। লাঠিটা তুলে নেন হাতে।

আশ্চর্য, তবু সুধাকান্ত কোনো প্রতিবাদ করেন না। জানলা দিয়ে দূর দিগন্তের দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে বসে থাকেন পাথরের মূর্তির মতো। তিনি যেন ভুলে গিয়েছেন দীর্ঘ পঞ্চাশ বছর ধরে নকুলচন্দ্রের সঙ্গে এ বাড়ির কী সম্পর্ক। প্র্যাকটিসের প্রথম অবস্থা থেকেই তিনি টাকসর মুখ দেখেননি। প্রথম যৌবনে তিনিও যেমন গুনতেন কোর্টঘরের কড়ি ও বরগা, মুখরিবাবুও তেমনি সারাদিন ধরে গুনতেন বটগাছের পাতা। সেই দুঃখের দিন থেকেই নকুলচন্দ্র তাঁর বড়বাবুর সঙ্গে নিজের ভাগ্যকে জড়িয়েছিলেন—সুখে-দুঃখে শতাব্দীর অর্ধাংশ পাড়ি দিয়ে এসেছেন একই নৌকোয়। নিমুর বিয়ের সম্বন্ধ পাকা করতে ঐ নকুলচন্দ্রকেই একদিন পাঠিয়েছিলেন। বিয়ের দিন বরযাত্রী যেতে পারেননি—একটা বড় কেসের দিন পালটানো যায়নি বলে—ঐ নকুলচন্দ্রকেই বরকর্তা করে পাঠিয়েছিলেন। বৈবাহিককে বলে পাঠিয়েছিলেন—‘আমি নগদ চাই না, নমস্কারী চাই না, ননদ পুটুলি চাই না—নির্মলের কাকাকে যেন বৌমা গরদের পাঞ্জাবি আর ধুতি দিয়ে প্রণাম করেন।’ মঞ্জুলার মা একই গরদের থান থেকে কেটে দু-জোড়া পাঞ্জাবি বানিয়েছিলেন—মঞ্জুলার স্বশুরের ও খুড়স্বশুরের নমস্কারী। সেসব দিনের কথা আজ সুধাকান্ত নিঃসংশয়ে ভুলে গিয়েছেন।

নকুলচন্দ্র ধীর পায়ে বেরিয়ে যেতে চান ঘর থেকে। সুধাকান্ত ফিরে ডাকেন না তাঁকে। দরজার কাছে গিয়ে নকুলচন্দ্র দেখেন, দাঁড়িয়ে আছেন সুধাকান্তের গুরুদেব। লাল চেলি পরা, গলায় গরদের চাদর, কপালে আধুলির মাপে একটা সিঁদুরের টিপ। তন্ত্রসাধক তিনি। কেউ কেউ বলে তিনি নাকি কাপালিক। চোখদুটো আগুনের ভাঁটার মতো জ্বলছে তাঁর। বয়সে ঐ গুরুদেবটি সুধাকান্তের চেয়ে বছর-বিশেক ছোটই হবেন—পঞ্চাশের কাছাকাছি বয়স তাঁর—তবু তিনি অনায়াসে সুধাকান্তের প্রণাম নিয়ে থাকেন।

নকুলচন্দ্র গুরুদেবকে নমস্কারমাত্র না করে বেরিয়ে আসেন ঘর থেকে। সিঁড়ি দিয়ে নামবার সময় গুনতে পান গুরুদেব তাঁকে শুনিye শুনিye বেশ জোর গলায় সুধাকান্তকে ধমকাচ্ছেন—‘আবার তুমি এসব অসৎ কুসঙ্গের সংস্পর্শ করছ? বলেছি না—ওদের দোতলায় উঠতে দেবে না!’

মিনমিনে গলায় সুধাকান্ত কী জবাব দিলেন সেটা আর গুনতে পেলেন না তিনি।

* * *

এতক্ষণ তীক্ষ্ণ মনোযোগ দিয়ে হেবো গুনছিল কেস-হিস্ট্রিটা। প্রবীরচন্দ্র থামতেই বলল, ‘বুঝলাম। এখন কী করতে চান আপনারা?’

কাকা বলেন, ‘আমি তো আশার কোনোও চিহ্ন দেখতে পাচ্ছি না।’

বাধা দিয়ে হেবো বলে, ‘কেন? এখনই নিরাশ হবার কী আছে? আমি তো আশার লক্ষণ ভালই দেখতে পাচ্ছি। প্রথমত দেখুন, সুধাকান্ত গুরুদেবের হাতে সিঁদুরের চাবিটা দেননি। নিজে উত্থানশক্তি-রহিত, কিন্তু সিঁদুর খোলার কাজটার জন্য সাহায্য নিয়েছিলেন নকুলবাবুর। দ্বিতীয়ত, নকুলচন্দ্র যখন খোকনের কথা বলেছিলেন তখন তিনি উদাস দৃষ্টি মেলে জানলার বাইরের দিকে তাকিয়ে ছিলেন। তৃতীয়ত, বোঝা যাচ্ছে গুরুদেব ইতিপূর্বেই নকুলচন্দ্রের দোতলার আসা বন্ধ করতে চেয়েছিলেন কিন্তু সে নিষেধ অমান্য করেছিলেন সুধাকান্ত।’

কাকা বলেন, ‘কী জানি বাপু, অত সূক্ষ্ম বিচার আমি বুঝি না। আমি প্রবীরকে বলছিলুম কাজটা হাতে নিতে। এ সাধারণ মানুষের কাজ নয়। পুলিশের সাহায্যও আমরা পাব না, কারণ সুধাকান্ত বেআইনি কিছু করছেন না। সম্পত্তি সুধাকান্তের নিজের উপার্জন, পৈতৃক নয়। তিনি যদি সজ্ঞানে ও স্ব-ইচ্ছায় তাঁর স্বোপার্জিত সম্পত্তি গুরুদেবকে উইল করে দিয়ে যান তাহলে আইনত আমাদের আপত্তি করবার কিছু নেই। মামলা-মোকদমা করে মঞ্জুলা হয়ত তার নাবালক সন্তানের জন্য একটা মোটামুটি খোরপোশ আদায় করতে পারবে—তাও পারবে কিনা জানি না। কিন্তু এত বড় অন্যায়াটা সহ্যই বা করে যাওয়া যায় কেমন করে?’

হেবো বলে, 'সে তো ঠিক কথাই। সুধাকান্তকে বাধা দেবার আইনগত অধিকার না থাকলেও নীতিগত অধিকার আমাদের আছে। এ যদি অধর্ম না হয়, তবে অধর্ম আর কাকে বলে? কিন্তু প্রবীরকাকু কেমন করে কী করবেন?'

কাকা বলেন, 'তা যদি আমি বাতলাতে পারব তাহলে আমিই তো গোয়েন্দা হতুম।'

হেবো গম্ভীর হয়ে বলে, 'সে কথা ঠিক। তা প্রবীরকাকু, আপনি কী বলছেন?'

—'আমি বলছি, আমাদের কিছু করতে হলে সর্বপ্রথম ঐ দুর্গের ভেতর ঢুকতে হবে। আমার পক্ষে ঐ ব্যুহে প্রবেশ করা অসম্ভব। গুরুদেবটিকে আমি চিনি। গভীর জলের মাছ ব্যাটা। বহু বিধবার সম্পত্তি গ্রাস করেছে আশ্রমের নামে। তাছাড়া চোরাই মাল পাচারের একটা ফলাও ব্যবসা তার আছে। বহুবার ফাঁদ পেতেছে পুলিশ—ধরা পড়েনি একবারও। অত্যন্ত ধড়িबाজ লোক। সেও আমাকে চেনে, আমিও তাকে চিনি। ফলে কোনো ছুতোনা তাতেই আমার পক্ষে ঐ ব্যুহে প্রবেশ অসম্ভব।'

হেবো বলে, 'বুঝেছি। ভীমসেনও ঠিক ঐ কথাই বলেছিলেন।'

—'ভীমসেন কে?'

—'মধ্যম পাণ্ডব। দ্রোণাচার্যের চক্রব্যূহ ভেদ করতে পারেননি তিনি। শেষমেশ আমারই মতো একটা বাচ্চা ছেলেকে ডেকে বলেছিলেন—তুই ঢোক ওর ভেতর।'

কাকিমা ভয় পেয়ে বলেন, 'না বাপু, এ সবার মধ্য হেবোর গিয়ে কাজ নেই। বড়ঠাকুরও বাড়িতে নেই—।'

বাধা দিয়ে হেবো বলে, 'ভয় নেই কাকিমা, অভিমন্যু-বধ পালা অভিনয় করছি না আমরা। বেরিয়ে আমি ঠিকই আসব।'

প্রবীরও আশ্বাস দিয়ে বলেন, 'তাছাড়া আমি তো থাকবই পিছনে।'

হেবো হেসে বলে, 'সেটা কোনো সাস্থনার কথা নয় প্রবীরকাকু, কারণ ভীমসেনও অভিমন্যুকে ঐরকম একটা প্রতিশ্রুতিই দিয়েছিলেন। কিন্তু আমি বলছি, কাজটা টেক আপ করতে পারতাম, সামনে ছুটিও আছে স্কুলের—ক্লাস কামাই হবে না; কিন্তু আমি ওখানে যাব কোন অছিলায়?'

প্রবীরবাবু বলেন, 'আমি সেটা আগেই ভেবে রেখেছি। নকুলবাবু আমাদের দলে। তিনি সুধাকান্তবাবুকে বলবেন, তুমি তাঁর ভাইপো বা ভাগ্নে। গাঁয়ে থাক—দুদিনের জন্য শহর দেখতে এসেছ—।'

হেবো বলে, 'তাতে দুটি অসুবিধা। প্রথম কথা, নকুলবাবু সম্বন্ধে আমি কিছুই জানি না। অথচ সুধাকান্তবাবু আজ পঞ্চাশ বছর ধরে তাঁকে চেনেন। জেরার মুখে আমি ধরা পড়ে যেতে পারি। মনে করুন, নকুলচন্দ্রের এক ছেলে পাঁচ বছর আগে সাপের কামড়ে মারা গিয়েছে। তাঁর ভাইপোর পক্ষে এত বড় খবরটা জানা থাকা উচিত। সেই প্রসঙ্গ উঠলে আমি কী বলব? দ্বিতীয়ত, নকুলবাবুর বাড়িও কৃষ্ণনগরে—তাঁর ভাইপো বা ভাগ্নে গ্রাম থেকে শহর দেখতে এলে তাঁর বাড়িতেই উঠবে। সুধাকান্তের স্বন্ধে তাকে নকুলচন্দ্র চাপাতে চাইবেনই বা কেন, আর তাঁর ভাইপোই বা ভাইবোনদের ছেড়ে ঐ নির্বাসন পুরীতে থাকতে চাইবে কেন?'

কাকা বলেন, 'সে কথা ঠিক।'

হেবো বলে, 'তার চেয়ে আমার মাথায় আর-একটা আইডিয়া এসেছে। আচ্ছা, নকুলবাবুর বাড়িতে কে কে আছেন?'

কাকিমা বললেন, 'ঠিক জানি না। তবে ওঁর অনেকগুলো ছেলে-মেয়ে নাতি-নাতনি আছে শুনেছি।'

হেবো বলে, 'ব্যস ব্যস, মা যতী রক্ষা করেছেন। বসুন, আসছি আমি—উপায় বার করেছি।'

বলেই বেরিয়ে যায় ঘর ছেড়ে। একটু পরে ফিরে আসে একখণ্ড টেস্ট পেপার নিয়ে। পাতা উন্টে কী দেখে নিয়ে বলে, 'নকুলবাবু বলুন, আমার বাবা তাঁর পরিচিত একজন মক্কেল। মামলা-সুত্রে আলাপ। আমি হাঁসখালি উচ্চ-মাধ্যমিক স্কুলের ছাত্র। এবার মাধ্যমিক পরীক্ষা দেব। আমার সিট পড়েছে কৃষ্ণনগর কলেজিয়েট স্কুলে। পরীক্ষা দিতে শহরে এসেছি। যেহেতু নকুলবাবুর বাড়িতে মা যতীর কৃপায় সারাদিন চ্যা-ভ্যা লেগে আছে, তাই তিনি আমাকে কয়েকদিনের জন্য সুধাকান্তবাবুর বাড়িতে এনে রাখছেন। দ্বিতলের অব্যবহৃত ঘরটায় থেকে আমি পড়াশুনা করব ও পরীক্ষা দেব। ব্যাপারটা

বুঝেছেন? আমি তাহলে দোতলাতেই থাকব। সকালবেলা পরীক্ষা দিতে যাচ্ছি বলে বেরিয়ে যাব, তারপর লুকিয়ে থাকব বাড়িতেই। যেহেতু আমি পরীক্ষার্থী তাই কেউ সন্দেহ করবে না যে, পরীক্ষা না দিয়ে আমি বাড়িতেই লুকিয়ে আছি।’

* * *

যে কথা সেই কাজ। পরদিন সকালের লালগোলা প্যাসেঞ্জারে নকুল ও প্রবীরচন্দ্রের সঙ্গে হেবো রওনা দিল কৃষ্ণনগর। হেবোর বাবা-মা কদিনের জন্য মধুপুরে গিয়েছেন ইন্সটারের ছুটিতে। হেবোরও স্কুল ছুটি; ইন্সটার, মহরম আর স্কুল ফাইনাল পরীক্ষার জন্য লম্বা ছুটি। মেজদা একবার হেবোকে জিজ্ঞাসা করেছিল সে কোথায় যাচ্ছে। হেবো জবাবে বললে, ‘কাকা যেখানে পাঠাচ্ছেন।’

নকুলচন্দ্র হেবোকে নিয়ে এলেন সুধাকান্তের বাড়িতে। ঠিক হল প্রবীরচন্দ্র কাছেপিঠেই কোনো একটা হোটলে থাকবেন। রোজ সন্ধ্যাবেলা হেবো গিয়ে তাঁকে দৈনন্দিন রিপোর্ট দেবে। সুধাকান্ত নকুলবাবুর পরিচিত এই ছেলটিকে কদিনের জন্য তাঁর বাড়িতে রাখতে রাজি হলেন। বৃহৎ প্রবেশে কোনো বেগ পেতে হল না। হেবোর আসল পরিচয়টা নকুলচন্দ্র শুধু জানিয়ে গেলেন মঞ্জুলা দেবীকে। প্রয়োজন ছিল না, কারণ দিদির কাছ থেকে হেবোর কীর্তিকলাপ ইতিপূর্বেই শুনেছিলেন তিনি। তবু মঞ্জুলা দেবী খুব যে একটা ভরসা পেলেন তা তাঁর মুখ দেখে মনে হল না।

সুধাকান্তবাবু হেবোকে ডেকে কোনো প্রশ্নই করলেন না। এসব দিকে যেন তাঁর খেয়ালই নেই। হেবো লক্ষ্য করে দেখে, তাঁর ঘরের সামনে সর্বক্ষণ একটা টিকিওয়ালা লোক বসে পাহারা দেয়। শুনল, লোকটা গুরুদেবের এক চালা—নাম কেবলানন্দ।

ঘরটার তালা খুলে যে ওকে পৌঁছে দিয়ে গেল সে বাড়ির ঠাকুর। হেবো তার স্বভাবসুলভ তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দিয়ে সমস্ত পরিস্থিতিটা বিচার করে দেখে নেয়। দ্বিতলের সিঁড়ি দিয়ে উঠেই একটা চণ্ডা বারান্দা, ডানদিকে, অর্থাৎ পূর্বদিকে, দুখানি ঘর। আর সিঁড়ির বাঁয়ে পশ্চিম দিকে আর একখানা কামরা। পূর্বদিকের প্রথম ঘরখানা এতদিন তালা বন্ধ পড়েছিল। পাশের ঘরখানিতে আছেন অসুস্থ গৃহকর্তা। সিঁড়ির ওপাশের পশ্চিমের ঘরখানায় গুরুদেব তাঁর সেই চালাটিকে নিয়ে থানা গেড়েছেন! অর্থাৎ ঐ পশ্চিমদিকের ঘরখানাই হচ্ছে শত্রুপক্ষের শিবির।

হেবো খুশি হয় মনে মনে। এতে তার সুবিধাই হয়েছে। ঠিক পাশের ঘরেই আছেন সুধাকান্ত। দুটি ঘরের মাঝখানে আছে একটি দরজা, ওপাশ থেকে বন্ধ। দরজার গায়ে বিলিতি ঝাড়ির কায়দায় গা-তালো লাগানো। গা-তালোয় চাবির যে ফুটো আছে তাতে চোখ লাগালে ও-পাশের ঘরের খানিকটা নজরে আসে—খাটের একটু অংশ। লোহার সিঁদুকটা অবশ্য দেখা যায় না। সেটা ঘরের অন্য প্রান্তে। হেবো মনে মনে স্থির করল—প্রথমই তাকে একখণ্ড সাদা কাচ যোগাড় করতে হবে। ঐ ছিদ্রপথে তাকে বারে বারে চোখ লাগাতে হবে; আর গুরুদেবটি যে রকম ঝানু লোক, তাক বুঝে কাঠির খোঁচা মেরে হেবোকে কানা করে দিতে পারেন। একতলার যে ঘরটায় মঞ্জুলা দেবী থাকেন সেটাও দেখল। সেটাও অব্যবহৃত হয়ে পড়েছিল দীর্ঘদিন। দেওয়ালের পলেস্তারা খসে খসে পড়েছে।

ঠাকুর, দারোয়ান, ঝি—সকলকেই লক্ষ্য করে দেখল। মনে হল না ওরা কোনো পক্ষে যোগ দিয়েছে। অন্তত ও-পক্ষে যে নয় সেটা বোঝা যায়, কারণ সবাই দেখা যাচ্ছে খোকনকে ভালবেসে ফেলেছে এবং সবাই গুরুদেবের অত্যাচারে অতিষ্ঠ। এগুলো শুভ লক্ষণ, ওরা বোধহয় বেইমানি করবে না। অবস্থা বেগতিক হলে ওরা এ-পক্ষেই যোগ দেবে। গুরুদেবটিকেও ভাল করে লক্ষ্য করল। কাপালিক বা তান্ত্রিকদের মতো দেখতে নয় মোটেই। প্রকাণ্ড তাঁর বপুখানি, মেদের মৈনাক! মাথায় কাঁচা-পাকা বাবরি চুল। বয়স আন্দাজ পঞ্চাশ। পেছায় একটি ভুঁড়ি, কপালে সব সময়েই একটা লাল সিঁদুরের টিপ, গলায় রুদ্রাক্ষের মালা। তান্ত্রিক বলতেই যেমন বাজে-পোড়া তালগাছের মতো পাকানো চেহারার কথা মনে পড়ে, এঁকে দেখে তা মনে পড়ে না মোটেই—বরং মনে হয় কৃষ্ণনগরের আহ্লাদি-পেছাদি পুতুলের একজন জোড়া ভেঙে এসেছে বুঝি। মেদবহুল ঐ চেহারার মধ্যে দেখবার মতো বস্তু হচ্ছে তাঁর চোখদুটো। প্রায় সব সময়েই ফুলোফুলো, গালের চর্বির তলায় ঢাকা থাকে, কিন্তু সময়-বিশেষে যেন জ্বলে ওঠে।

প্রথম দর্শনেই হেবোর ওপর যেন তাঁর স্নেহের সমুদ্র উথলে উঠল। হেবো হৃদয়-ভক্তিভরে তাঁকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করল বলেই বোধহয়। গুরুদেব বললেন, ‘কল্যাণ হোক! তোমার নামটি কী বাবা?’

—‘আজ্ঞে ভাল নাম বটুকনাথ বটব্যাল, ডাক নাম বটু।’

—‘ভাল, ভাল। তা বাবা বটু, তুমি বুঝি হাঁসখালি ইঙ্কুলের ছাত্র? সায়েন্স, না হিউম্যানিটিজ?’

—‘আজ্ঞে সায়েন্স।’

—‘খুব ভাল। এটা তো সায়েন্সেরই যুগ! আচ্ছা এস তুমি। মন দিয়ে পড়াশুনা কর।’

গুরুদেবের চেলাটি হাবাগোবা ধরনের; কিন্তু বুদ্ধিতে কম হলে কী হবে, লোকটার গায়ে অসুরের শক্তি, আর বুলডগের মতো একরোখা। সম্ভবত লোকটা উৎকলবাসী। সুধাকান্তের দরজার সামনে থানা গেড়ে বসে আছে যেন একটা ব্লাড-হাউন্ড কুকুর! গুরুদেব ওকে ডাকেন, ‘বাবা কেবল’ বলে—নাম নাকি কেবলানন্দ।

নিজের ঘরে এসে হেবো তার বইপত্র খুব আড়ম্বর করে সাজিয়ে রাখল টেবিলের ওপর, আর পিছনের একটা কুলুঙ্গিতে লুকিয়ে রাখল তার গোয়েন্দাগিরির সরঞ্জাম—নোটবই, ডায়েরি, ম্যাগনিফাইং গ্লাস, মাপবার ফিতে।

প্রথম দিনটা গেল পরিস্থিতিটা ঠিকমতো আঁচ করে নিতে, এ নাটকের চরিত্রগুলিকে ভালমতো সমঝিয়ে নিতে। হেবো বুঝেছে—তার প্রথম, প্রধান ও একমাত্র কাজ হচ্ছে পাশের ঘরের ওপর নজর রাখা। যতদূর জানা গিয়েছে সুধাকান্ত তাঁর পুরাতন উইলটি লোহার সিন্দুক থেকে বার করেছেন, সেই উইল-মতে নির্মলেন্দুবাবুরই সমস্ত সম্পত্তি পাওয়ার কথা। যেহেতু নির্মলেন্দু গত হয়েছেন, সুতরাং আইনমতে নির্মলেন্দুর স্ত্রী মঞ্জুলা দেবী ও নাবালক পুত্র এখন সেই সম্পত্তির অধিকারী। কিন্তু ভাবগতিক দেখে অনুমান করা যেতে পারে, সুধাকান্ত উইলটি বার করে রেখেছেন সেটা পালটাবার জন্য। আগের উইলটি যদি তিনি নষ্ট করেন তাহলেও ভাবনার কিছু নেই, কারণ আইন বলছে যে, উইল না করে তিনি যদি মারা যান, তাহলেও মঞ্জুলা আর তাঁর সন্তান সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত হবেন না।

কিন্তু দুর্ভাবনার শেষ তো সেখানেই নয়—সুধাকান্ত আবার যে নতুন উইল করতে চান। তিনি না চাইলেও গুরুদেবটি তাঁকে দিয়ে তাই করাতে চান। যে কোনো কারণেই হোক সুধাকান্ত এখন সম্পূর্ণভাবে ঐ গুরুদেবটির করতলগত। কাঁচপোকা যেমন তেলাপোকাকে টেনে নিয়ে যায়, গুরুদেবও তেমনি অনিবার্যভাবে হিড়হিড় করে টেনে নিয়ে যাচ্ছেন সুধাকান্তকে। সুধাকান্তের যেন ব্যক্তিগত বিচার-বিবেচনা, শুভবুদ্ধি বলে কিছু নেই, তিনি যেন কলের পুতুল। ফলে দু-চার দিনের মধ্যেই—অর্থাৎ সুধাকান্তের সই করার ক্ষমতা নৃপ্ত হবার আগেই—ঐ গুরুদেবটি তাঁকে দিয়ে উইলটি পালটিয়ে নিতে চান। আচ্ছা, ইতিমধ্যেই সে দুষ্কর্মটি হয়ে যায়নি তো? হেবো অনেক ভেবে শেষ পর্যন্ত সমাধানে এসেছে—না। কারণ মঞ্জুলা দেবীর কাছ থেকে জানা গিয়েছে, ইতিমধ্যে এক ডাক্তারবাবু ছাড়া বাইরের লোক কেউ আসেনি এ বাড়িতে। উইল পালটাতে হলে সাক্ষী চাই। গুরুদেব সাক্ষী হলে চলবে না। কেবলানন্দ সাক্ষী হলে সেটা খুব জোরদার হবে না। ডাক্তারবাবু যখন আসেন তখন ঠাকুর ব্যাগ হাতে ঘরে থাকে। ফলে উইলটা এখনও পালটানো হয়নি। সাক্ষীর অভাবই তার প্রমাণ। কলকাতা থেকে আসবার সময় নকুলচন্দ্রের কাছ থেকে হেবো আইনের ব্যাপারটা ভালভাবে বুঝে নিয়েছে। নকুলচন্দ্র নামকরা উকিলের মুখরি ছিলেন—আইন ভালরকমই জানেন তিনি। আইনঘটিত খিটিমিটিগুলো বুঝে নিয়েছে বলেই হেবো জানে, একটা জোরদার সাক্ষী না রেখে গুরুদেব উইলটা পালটাবার ব্যবস্থা করবেন না।

খাওয়া-দাওয়া সেরে শুতে যাবার আগে হেবো তার নোটবই বার করে সমস্যার সম্ভাব্য সমাধানগুলি বিজ্ঞানসম্মতভাবে ছকে ফেলল :

নিম্নলিখিত উপায়ে সমস্যার সমাধান সম্ভব :

১। নতুন উইল যদি সুধাকান্ত না করতে পারেন—

(ক) উইল লেখার আগেই সুধাকান্তের আকস্মিক মৃত্যু—

(তাহলে তাঁকে খুন করতে হয়—অসম্ভব!)

(খ) উইল লেখার আগেই সুধাকান্তের সই করবার ক্ষমতা লোপ—

(তা কেমন করে সম্ভব?)

২। নতুন উইল যদি আইনত সিদ্ধ না হয়—

(ক) যদি সাক্ষী না থাকে—

(গুরুদেবটি খলিফা ব্যক্তি—সাক্ষীর ব্যবস্থা তিনি করবেনই।)

(খ) সুধাকান্তের সই যদি না মেলে—

(অসম্ভব—যেহেতু তিনি সজ্ঞানে স্বইচ্ছায় সই করছেন।)

(গ) যদি আইনের অন্য কোনো খুঁত থাকে—

(অসম্ভব—সুধাকান্ত আইনজ্ঞ লোক।)

(ঘ) যদি প্রমাণ করা যায় সুধাকান্তের মানসিক স্বৈর্য ছিল না—

(প্রায় অসম্ভব—কারণ তিনি যে পাগল নন তা সুপ্রতিষ্ঠিত।)

৩। নতুন উইল যদি গুরুদেব উপস্থাপিত করতে না পারেন—

(ক) গুরুদেব যদি মারা যান—

(তাহলেও লাভ নেই—গুরুদেবের ওয়ারিশ সম্পত্তি পাবে।)

(খ) উইল যদি হারিয়ে যায়—

(অসম্ভব—গুরুদেব ওটা সযত্নে রাখার ব্যবস্থা করবেন।)

(গ) উইল যদি চুরি যায়—

(একমাত্র সম্ভাবনা—গুরুদেবের সঙ্গে শার্লক হোবোর বুদ্ধির রণাঙ্গণে দ্বৈরথ সমরের ফলাফলই এর জবাব দিতে পারে।)

* * *

যুক্তিপূর্ণ বিশ্লেষণ করে আলো নিবিয়ে শুয়ে পড়ার উপক্রম করছে, হঠাৎ মনে হল কে যেন তার দরজায় টোকা দিচ্ছে। টপ করে খাট থেকে লাফিয়ে নেমে পড়ে হেবো। কে ডাকছে তাকে! সন্তর্পণে দরজা খুলে দেখে অন্ধকারে ভূঁতের মতো দাঁড়িয়ে আছে কেবলানন্দ।

—‘বাবা আপনাকে ডাকছেন।’

কেবলানন্দ গুরুদেবকে ‘বাবা’ ডাকে।

—‘উনি এখনও ঘুমোননি?’

—‘না, এখনও তাঁর সেবা হয়নি।’

সেবা হয়নি? কার সেবা হয়নি? কিসের সেবা হয়নি? হেবো কোনো কথা বলে না। ওর পেছনে-পেছনে চলে আসে শত্রুশিবিরে—গুরুদেবের ঘরে। এতক্ষণে মালুম হয় ‘সেবা’ জিনিসটা কী। গুরুদেব নৈশ আহারে বসেছেন। কার্পেটের একটা বড় আসন বেমানাম হারিয়ে গিয়েছে তাঁর বিশাল বপুর অন্তরালে। তাঁর সামনে একটা বড় পাথরের থালায় স্তূপাকার করা গব্য ঘিয়ে ভাজা লুচি। পাশে ম্যাগনাম-সাইজ একটা জামবাটিতে মাংস—খুড়ি! মহাপ্রসাদ। রুপোর একটি মাঝারি বাটিতে দেড়পো আন্দাজ ঘন ক্ষীর, আর রেকাবিতে খান-আষ্টেক সরপুরিয়া। আরও তিন-চারটে বাটিতে নানান ব্যঞ্জন। এই হচ্ছে বাবাজীর নৈশ ‘সেবা’!

হেবো এবার আর ছদ্মভক্তির ভরে নয়, সত্যিই ভক্তিভরে তাঁকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করল। পঞ্চাশ বছর বয়সে যিনি এই পরিমাণ খাদ্যসামগ্রী উদরস্থ করবার সাহস রাখেন তিনি নমস্য বইকি!

গুরুদেব ওকে সামনের আসনে বসতে বললেন। বলার প্রয়োজন ছিল না। ওঁর ‘সেবার’ রকম-সকম দেখে এমনিতেই সে ধপ করে বসে পড়েছিল।

মধুর হেসে গুরুদেব বলেন, ‘আহারাদি হয়েছে?’

—‘আঞ্জে হ্যাঁ।’

গুরুদেব হেবোর হাতে একটি নির্মাল্য দিয়ে বলেন, ‘এই জবাফুলটি সবসময় কাছে কাছে রাখবে। ভয় নেই, ভালভাবেই পাশ করে যাবে তুমি। আর হ্যাঁ, রাত্রে শয়নের পূর্বে এক গ্লাস করে কমলালেবুর সরবত খাবে। রাত জেগে অধ্যয়ন করতে হচ্ছে তো! ওতে পিণ্ড প্রকুপিত হতে পারে না।’

হেবো অবাক হয়ে চেয়ে থাকে। চৈত্র মাসে কমলালেবু কোথায় পাবে প্রশ্ন করতেও ভুলে যায়। গুরুদেব বলেন, ‘বাবা কেবল, ওকে এক গ্লাস সরবত দাও।’

কেবলানন্দ বিনা বাক্যব্যয়ে উঠে যায়। কুঁজো থেকে ঢেলে একগ্লাস ঠাণ্ডা জল কাচের গ্লাসে করে হেবোর সামনে রাখে। ব্যাপারটা হেবো বুঝতে পারে না। ওর সে অবাক চাহনি দেখে গুরুদেব হো হো করে হেসে ওঠেন। বলেন, ‘ওহো, তাইতো, ওটা তো সাদা জল! দাও গ্লাসটা আমাকে।’

গুরুদেব নিজেই গ্লাসটা টেনে নেন। একটা গামছা দিয়ে সেটাকে ঢেকে দেন। তারপর সেই গামছার ভেতর ডান হাতটা ঢুকিয়ে জলটা স্পর্শ করেন। যেন কিছুই হয়নি। এইভাবে এবার গামছাটা সরিয়ে নিয়ে বলেন, ‘নাও, এবার খাও।’

স্তুভিত হয়ে যায় হেবো। ওর সামনে একগ্লাস কমলা রঙের সরবত! কথা ফোটে না ওর মুখে। দু-এক মিনিট কেটে যাবার পর সম্বিৎ ফিরে পায় একটা অট্রহাসি শুনে। শুনতে পায় গুরুদেব বলছেন—‘ওরে ও কেবল, আর-একটা খালি গ্লাস দে বাবা। বেচারি ভয় পাচ্ছে। গাঁয়ের ছেলে তো! হাঁসখালি গাঁ ছেড়ে বাইরে আসেনি কখনও বোধহয়।’

যম্বুচালিতের মতো কেবলচন্দ্র আর একটা খালি গ্লাস এগিয়ে দেয়। কিছুটা সরবত সে-গ্লাসে ঢেলে নিয়ে গুরুদেব অগ্নানবদনে সেটা এক নিশ্বাসে পান করেন। বলেন, ‘খেয়ে নাও বাবা বটুক। ওতে বিষ মাখানো নেই।’

বিনা বাক্যব্যয়ে হেবো ঢকঢক করে খেয়ে ফেলে। চমৎকার কমলালেবুর সরবত!

ইষ্টদেবকে নিবেদন করে গুরুদেব এবার সেবায় মনোনিবেশ করেন। কাঠের পুতুলের মতো বসে থাকে হেবো। বোঝে, কঠিন বিচ্ছুর পাল্লায় পড়েছে সে এবার। মন্ত্রশক্তিতে সে এতদিন বিশ্বাস করত না। অনেক সাধু-সন্ন্যাসী এসব বিভূতির খেলা দেখাতে পারেন শুনেছিল আগে—কখনও প্রত্যক্ষ করেনি। এখনও বুঝে উঠতে পারছে না, এইমাত্র যা দেখল তা সত্যই অলৌকিক ক্ষমতা না সস্তা মাদারির খেল—ম্যাজিক। কিন্তু গুরুদেব তাকে চিন্তা করবার অবকাশ না দিয়েই বলে ওঠেন : ‘তোমার তো সায়েন্স, নয়?’

—‘আপ্তে হ্যাঁ।’

—‘তা বলে বাঙলা-ইংরাজি দুটোকে যেন উপেক্ষা করো না; জানো তো, ঐ দুটোতেই সায়েন্সের ছেলেরা বেশি ফেল করে। বাঙলায় কেমন নম্বর পেয়েছিল টেস্ট পরীক্ষায়?’

হেবো অগ্নানবদনে বলল, ‘বাষট্টি।’

লুচি দিয়ে মহাপ্রসাদের হটাৎকথানেক ওজনের একটি কণিকা জড়িয়ে মুখগহ্বরে নিক্ষেপ করে গুরুদেব বলেন, ‘এস্ কী লিখেছিলে?’

—‘এস্?’

—‘হ্যাঁ গো, ‘এস্’—মানে প্রবন্ধ। বাঙলা সেকেন্ড পেপারে প্রবন্ধ থাকে না তোমাদের?’

গুরুদেব কি টিউশনি করেন নাকি? মায় সেকেন্ড পেপার পর্যন্ত জানা আছে তাঁর? সামলে নিয়ে বলে, ‘ও এস্! আমাদের ‘এস্’ ছিল “তোমার প্রিয় লেখক”।’

দাঁতের ফাঁক থেকে মহাপ্রসাদের একটা কুচি বার করবার চেষ্টা করতে করতে গুরুদেব বলেন, ‘অ। তা কী লিখেছিলে তুমি? কে তোমার প্রিয় লেখক?’

—‘আপ্তে রবীন্দ্রনাথের কথা লিখেছিলাম।’

—‘আশ্চর্য!’

আশ্চর্য হয় হেবোই। এতে আশ্চর্যের কী আছে রে বাবা? বলেও সে কথা—‘কেন, আশ্চর্য মনে হচ্ছে কেন?’

—‘আমাকে যদি কেউ ও প্রশ্ন দিত—আর আমি যদি তোমার বয়সী ছেলে হতাম, তাহলে আমি লিখতাম—কনান ডয়েল।’

কণ্ঠনালী পর্যন্ত শুকিয়ে ওঠে হেবোর। লোকটা ‘খট-রীডিং’ জানে নাকি? মানে হেবোর মনের কথাও ও লোকটা বুঝতে পারছে নাকি? না হলে হঠাৎ কনান ডয়েলের নাম আসে কোথা থেকে? একটা উণ্টো চাল চালতে হেবো বলে—‘কনান ডয়েল কে? কোনো সাহেব?’

মহাপ্রসাদের একটি টেংরি চুষতে চুষতে গুরুদেব বলেন, ‘সার আর্থার কনান ডয়েল হচ্ছেন শার্লক হোমসের সৃষ্টিকর্তা।’

হেবো এবার স্পিক-টি-নট! কেঁচো খুঁড়তে আবার কোন সাপ বেরুবে কী জানে! দু-চার মিনিট কোনো কথা নেই। হেবো বসে বসে ঘামছে। গুরুদেব নিমীলিত নেত্রে হাড় চুষছেন। হঠাৎ আবার তিনি হাসি-হাসি মুখে বলেন, ‘কই তুমি তো বললে না শার্লক হোমস্ কে? তিনি কোনো সাহেব নাকি?’

হেবো এবারও কোনো সাড়াশব্দ করে না।

হঠাৎ চোখদুটি খুলে গুরুদেব বলেন, ‘ওহো, তোমার একখানা বই নিয়ে এসেছিলাম। দেখা হয়ে গিয়েছে। ওটা নিয়ে যাও তুমি।—কেবল বাবা—’

আর কিছু বলতে হল না। কেবলানন্দ গুরুদেবের ঝোলা ঝেড়ে একখণ্ড টেস্ট পেপার এনে হেবোর হাতে দেয়। আবার চোখ বুজে লুচি-মাংসের সেবা করতে করতে গুরুদেব বলেন, ‘বাবা বটু, ঐ গ্রন্থের পাঁচশো একত্রিশ পৃষ্ঠাটা খোলো তো একবার।’

হেবো দুরদুর বক্ষে নির্দেশমতো পৃষ্ঠাটা খোলে। গুরুদেব নিমীলিতচক্ষু অবস্থাতেই বলেন, ‘ওটা হাঁসখালি স্কুলের বাঙলার সেকেন্ড পেপার। তাই নয়?’

হেবো জবাব দেয় না।

—‘হয় নম্বর প্রথমটা এবার দেখ। মনে কর তুমি এবার হাঁসখালি স্কুলে টেস্ট পরীক্ষা দিচ্ছ। তোমার সামনে তিনটি অলটারনেটিভ ‘এস্’ আছে—বাংলার বর্ষাকাল, সংবাদপত্র আর ছাত্রজীবনের অভিজ্ঞতা। কোনটা লিখবে তুমি?’

খাচ্ছেন গুরুদেব, অথচ গলাটা বুজে গিয়েছে হেবোর। কী বলবে ভেবে পায় না। আবার দু-চার মিনিট আহারপর্ব চালিয়ে ক্ষীরের বাটিটা টেনে নেন গুরুদেব। হঠাৎ যেন খেয়াল হয়েছে সেইভাবে বলে ওঠেন, ‘ওহো! কী ভুলো মন দেখ আমার! তোমাকে বলছি—মনে কর তুমি হাঁসখালি স্কুলের ছাত্র! মনে করার কী আছে, তুমি তো সত্যিই তাই। নয়?’

হেবো ভাবছিল একগ্লাস জল পেলো খেত।

—‘আচ্ছা থাক। এবার ঘরে যাও তুমি। সামনে পরীক্ষা, রাত জাগা ঠিক নয়।’

হেবো এবার আর প্রণাম করে না। মাথাটা নিচু করে টেস্ট পেপারখানা বগলদাবা করে রওনা দেয়। দরজার কাছ পর্যন্ত গিয়েছে, পিছন থেকে গুরুদেব ডাকেন—‘বাবা হেবো!’

—‘আজ্ঞে?’—ঘুরে দাঁড়ায় হেবো।

এবং তৎক্ষণাৎ বুঝতে পারে, প্রচণ্ড ভুল করে বসেছে সে। কিন্তু উপায় নেই, ডাকে সাড়া দিয়ে ফেলেছে যখন তখন আর কী করা যায়! তবু যতদূর সম্ভব ম্যানেজ করে নেবার চেষ্টায় বলে, ‘আমাকে হেবো বলে ডাকলেন যে? আমার নাম বটু।’

—‘ওহো! তাই তো! আমার ভারি ভুলো মন। হেবো তো তোমার নাম নয়, শার্লক হোমসের কথা ভাবতে ভাবতে আমি হেবোর কথা ভেবে ফেলেছি! তুমি তো বটুক,—হেবো হবে কেন? তুমি তো হাঁসখালি স্কুলের পাতিহাঁসের মতো লক্ষ্মী ছেলে—আর হেবোটা হচ্ছে একটা হাড়-বজ্জাত বোম্বেটে শয়তান!’

কানদুটো লাল হয়ে ওঠে হেবোর। উপায় নেই। এ অপমান তাকে সহ্য করে যেতে হবে। আজ সে হেবো নয়, সে বটুকনাথ বটব্যাল। মনে মনে ভাবে, শিশুপালের শত গালাগাল সহ্য করতে হয়েছিল স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণকে। সেও করবে। তারপর শিশুপাল-বধের সময় হবে এর কড়ায়-গুণায় শোধ। কোনোমতে নিজেকে সামলে নিয়ে বলে, ‘আর কিছু বলবেন?’

—‘হ্যাঁ বাবা ব্যাটবল, বলব। তুমি প্রবীরকে চেন? প্রবীর মুখজ্জ্ব?’

ধরা যখন পড়ে গিয়েছে তখন আর তাস লুকিয়ে লাভ নেই। সম্মুখ রণক্ষেত্রেই শিশুপাল-বধ করতে হবে তাকে। আর আত্মগোপন নিরর্থক। বললে, ‘হ্যাঁ চিনি। কিন্তু কেন বলুন তো?’

—‘পবুকে বোলো, মহাভারতের অভিমন্যু-বধ অধ্যায়টা পড়তে। বোলো আমি বলছি—মহারথীতে মহারথীতে যেখানে যুদ্ধ হয়, সেখানে অভিমন্যুর মতো চ্যাংড়াকে বলি দিতে পাঠাতে নেই। বড় করুণ ঐ অভিমন্যুর চ্যাপটা হয়ে যাবার চ্যাপটারটা! নয়?’

আর সহ্য করতে পারে না হেবো। সে তো আর শ্রীকৃষ্ণ নয়! ভীমসেনও পারেনি কীচককে ক্ষমা করতে। ছদ্মবেশ ত্যাগ করে বধ করে ফেলেছিল কীচককে। বললে, ‘আপনার বাবা বেঁচে আছেন?’

সরপুরিয়া চেবানো বন্ধ হয়ে যায় গুরুদেবের, চোখদুটো ধক করে জ্বলে ওঠে। বলেন, ‘আছেন, কিন্তু কেন হে ছোকরা? সে খোঁজে তোমার কী প্রয়োজন?’

—‘না, তাই বলছিলাম। তাঁর জন্যেই দুঃখ হচ্ছে আমার।’

চৰ্চণকার্য বন্ধ হয়ে গিয়েছে গুরুদেবের।

হেবো দাঁতে দাঁতে চেপে চিবিয়ে চিবিয়ে বলে, ‘দেখুন আপনি বিচার করে। রথী-মহারথীর মধ্যে লড়াই হচ্ছিল—অভিমন্যু বয়সে ছোট, তবু ক্ষত্রিয় যোদ্ধা সে। লড়াইয়ে সেও প্রাণ দিল, তাতে দুঃখ নেই। মরল বোঁটা জয়দ্রথও। তারও রেহাই পাওয়ার উপায় ছিল না। কিন্তু ও চ্যাপটারের সবচেয়ে করুণ অধ্যায় কী জানেন? খামোখা ঐ পাষাণ জয়দ্রথের বাপ বেচারির মুণ্ডু গেল উড়ে।’

বলেই অ্যাৰাউট টার্ন!

এবং তৎক্ষণাৎ ফরোয়ার্ড মার্চ!

যতটা কঠিন মনে হয়েছিল সমস্যাটা তার চেয়ে অনেক, অনেক বেশি কঠিন। কঠিন এবং জটিল। গুরুদেব লোকটি পাক্কা খলিফা! খলিফার চেয়েও বড়, একটি ধড়িবাজ ঘড়িয়াল! হেবোর নাড়ী-নক্ষত্র বোঁটা জেনে ফেলেছে। হয়ত প্রবীরকাকুর পেছনে ওর গুপ্তচর ঘুরছে। হয়ত লোকটা একটা পাক্কা আঁধারের কারবারী। এত দুঃখেও একটু গর্ববোধ না করে পারল না হেবো। তাহলে অন্ধকার মহলের কারবারীরাও শার্লক হেবোকে চিনতে শুরু করেছে!

কিন্তু উপস্থিত সমস্যাটার কী করা যায়? আলো নিবিয়ে শুয়ে পড়ার আগে হেবো তার নোটবইতে চতুর্থ সম্ভাবনার কথাটাও লিখে রাখল :

(৪) নতুন উইল করবার আগেই যদি সুধাকান্তের চেতনা ফেরে :

(ক) যদি গুরুদেব-বাবাজির স্বরূপটা তাঁকে বুঝিয়ে দেওয়া যায় (কঠিন কাজ!)

(খ) যদি মঞ্জুলা দেবী আর তাঁর সন্তানকে তিনি ভালবেসে ফেলেন।

(বাবাজি বেঁচে থাকতে?)

* * *

পরদিন সকালে হেবো লক্ষ করল একটা সিন্ধের চাদর কাঁধের ওপর ফেলে নাটের গুরু তাঁর ঝোলা ও লাঠি নিয়ে কোথায় চলেছেন ছড়মুড়িয়ে। তৎক্ষণাৎ চটিটা পায়ে গলিয়ে হেবোও নেমে আসে ওপর থেকে। গুরুদেব গেট খুলে বাইরে এসে একটা রিকশা ভাড়া করে কোথায় যেন রওনা হয়ে পড়লেন। হেবো স্থির করল—ওঁকে অনুসরণ করতে হবে। কোথায় যাচ্ছে লোকটা? উদ্দেশ্য কী? দ্বিতীয় একটা রিকশাকে ইঙ্গিত করামাত্র দাড়িওয়ালা একজন রিকশাওয়ালা এগিয়ে এল।

—‘কোথায় যাবেন বাবু?’

রিকশায় উঠে বসে হেবো বললে, ‘ঐ রিকশাটার পিছু-পিছু চল।’

রিকশাওয়ালা ওকে নিয়ে তৎক্ষণাৎ রওনা দেয়। আগের রিকশাখানা প্রায় পঞ্চাশ ফুট সামনে চলেছে। গুরুদেব ওকে নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেননি। কোথায় চলেছেন উনি? গলি পার হয়ে বড় রাস্তায় পড়েই সোজা উত্তরমুখো বাঁক নিল। হেবোর রিকশাখানা কিন্তু বাঁকের মুখে দাঁড়িয়ে পড়ল হঠাৎ।

হেবো ব্যস্ত হয়ে বলে, ‘একি? দাঁড়িয়ে পড়লে কেন?’

মুখটা না ফিরিয়েই রিকশাওয়ালা বলে, ‘এখানে নেমে ফিরে যাও। আমিই ফলো করছি ওকে।’

হেবো অবাক হয়ে যায়। কী আশ্চর্য! ঐ একমুখ দাড়িওয়ালা রিকশাচালককে সে পর্যন্ত চিনতে পারেনি! হেবো নেমে পড়ে সেখানেই। উত্তরমুখো ঘুরে প্রবীরচন্দ্রের রিকশাখানা দ্রুতগতি এগিয়ে যায় দৃষ্টির আড়ালে।

সন্ধ্যাবেলায় যথারীতি হেবো হাজিরা দিল প্রবীরচন্দ্রের বোর্ডিংএ। শুনল গুরুদেব সকালবেলা গিয়েছিলেন পোস্ট অফিসে। একখানি টেলিগ্রাফ করেছেন তিনি। প্রবীরচন্দ্র অনেক কায়দা করে জেনে এসেছেন, সেখানি গিয়েছে কলকাতার একটি সলিসিটর ফার্মের নামে। মিস্টার জি. এন. দে অ্যাডভোকেটকে গুরুদেব আগামী শুক্রবার আসতে অনুরোধ করেছেন।

প্রবীরচন্দ্র বলেন, ‘বৃধবার অর্থাৎ পরশুদিনের মধ্যেই আমাদের যা হয় করতে হবে। দে-সাহেব হচ্ছেন ওঁর আশ্রমের অ্যাটর্নি। উইলে সাক্ষী থাকতে আসছেন তিনি।’

হেবো বলে, ‘কলকাতায় গিয়ে যদি দে-সাহেবকে সব কথা খুলে বলা যায়?’

‘তাহলেও লাভ নেই। তিনি ওঁর অ্যাটর্নি—ওঁরই স্বার্থ দেখবেন। তাছাড়া কাজটা বেআইনি তো হচ্ছে না কিছু। সুধাকান্তবাবুর স্বাধীন ইচ্ছায় তুমি-আমি বাধা দেবার কে?’

—‘তাহলে?’

—‘তাই তো ভাবছি। আর তো সময় নেই। কী করা যায়?’

হেবো ফিরে আসে তার ঘরে। একবার চেষ্টা করে সুধাকান্তের সঙ্গে দেখা করবার, চতুর্থ সম্ভাবনার সূত্রটা টিকবে কিনা পরীক্ষা করতে; কিন্তু কেবলানন্দ দরজায় পাহারা বসে আছে। ভেতরে ঢুকতেই দিল না সে।

ডাক্তার নবীনচন্দ্র এ শহরের নামকরা ডাক্তার। সুধাকান্তের পরিবারের সব কথাই জানেন। শেষ পর্যন্ত হেবো তাঁরই শরণাপন্ন হল। ডাক্তারবাবুর চেম্বারের শেষ রুগীটি বিদায় নিলে এগিয়ে এল হেবো। বলল তার কথা, মানে সুধাকান্তবাবুর উইলের কথা। শুনে ডাক্তারবাবু বলেন, ‘কিন্তু তোমাকে তো চিনতে পারছি না!’

হেবো নিজের প্রকৃত পরিচয়ই দিল, অর্থাৎ মঞ্জুলা দেবী ওর কাকিমার ছোট বোন।

ডাক্তারবাবু শেষ পর্যন্ত বললেন, ‘সবই তো জানি বাবা; কিন্তু আমি কী করতে পারি? জেনে-শুনে বিষ তো আর খাওয়াতে পারি না!’

তা ঠিক। ফিরে আসে হেবো।

সারা রাত ঘুম হল না বেচারির। হেরে যাবে সে? অমন একটা ধড়ি বাজ বদমায়েসের খপ্পর থেকে একটি বিধবা আর তাঁর নাবালক ছেলেকে রক্ষা করতে পারবে না? লোকটা অত্যন্ত ধূর্ত, সম্ভবত মন্ত্র-তন্ত্রও জানে। সুধাকান্তকে হয়ত সে সম্মোহিত করে ফেলেছে। রক্তচোষা বাদুড় যেমন দৃঢ় আলিঙ্গনে জড়িয়ে ধরে শিকারকে শেষ করে দেয়—এই পরিবারটিকে গুরুদেব তেমনি সম্মোহিত আলিঙ্গনাবদ্ধ করেছেন। শেষ বিন্দু রক্তটি নিঃশেষ হবার আগে তিনি নড়ছেন না।

সারারাত ছটফট করতে করতে ভোররাত্রের দিকে একটা সুস্থ চিন্তার ক্ষীণ আভাস এল ওর মাথায়। একটা ঘটনা মনে পড়ে গেল ওর। গত বছর দোলের দিনের কথা। চট করে উঠে বসে হেবো। আলোটা জ্বালে। দোল কী মাসে হয়? ফাল্গুন; অর্থাৎ মার্চ-এপ্রিল। নোটবইটা খোলে—হ্যাঁ, নোটবইতে টোকা আছে ঘটনাটা। এই তো একটা নতুন সম্ভাবনার সূত্র পাওয়া গিয়েছে! গিয়েছে কি? খুব কঠিন কাজ। ভাগ্যের ওপর অনেকটা নির্ভর করতে হবে। কিন্তু ভাগ্য তো তাদেরই সহায়তা করে যারা পুরুষকারকে কাজে লাগায়!

অন্ধকার ঘরে পায়চারি করতে করতে চিন্তা করতে থাকে। ধাপে ধাপে ধীরে ধীরে কার্যক্রমের সোপানগুলি সাজিয়ে নেয় মনে মনে। প্রথম কাজ কী? কী কী বাধাবিঘ্ন দেখা দিতে পারে? কী কী তার সমাধান? তারপর দ্বিতীয় পদক্ষেপ। কোন কোন বিপত্তি আসতে পারে?

হঠাৎ জানলা দিয়ে তাকিয়ে দেখে ভোরের আলো ফুটে উঠছে। সকাল হয়ে এসেছে। ভোরবেলা একটা লোকাল ট্রেন আছে—কলকাতা যাওয়ার। ঐ ট্রেনেই যেতে হবে তাকে। প্রবীরচন্দ্রকে খবর দেওয়ার সময় নেই, প্রয়োজনও নেই। তারও আর পাহারা দেওয়ার কোনো দরকার নেই। শুক্রবারের আগে যখন উইল লেখা হবে না তখন এখানে মাটি কামড়ে পড়ে থেকে কী হবে?

ভোরের ট্রেনেই হেবো ফিরে এল কলকাতায়। এল ওদের বাড়িতে। বাবা-মা এখনও ফিরে আসেননি, বাঁচা গেল। কাকাও বাড়ি নেই—কোথায় যেন বেরিয়েছেন। কাকিমা ওকে দেখে বললেন, ‘কী হল রে হেবো, খবর কী?’

—‘শিগ্গির আমাকে কিছু টাকা দাও দেখি!’

—‘টাকা? কত টাকা? কী করবি?’

—‘কী করব তার ফিরিস্তি শুনে কী হবে? কিন্তু তুমি কি ভেবেছিলে এ কাজ একেবারে ফোকটুসে হয়ে যাবে? আমার প্রফেশনাল ফিজ তো আমি দাবিই করছি না। প্রথমত, এখনও আমি প্রফেশনাল

নই, দ্বিতীয়ত, এটা ঘরোয়া কাজ। তোমার কাছে আবার ফি নেব কী? তবু হাত-খরচা তো আছে।’

—‘কত টাকা লাগবে বল?’

—‘আপাতত গোটা-পঞ্চাশ ছাড়।’

—‘মঞ্জুলা কেমন আছে?’

—‘ও সব খেজুরে আলাপ পরে হবে কাকিমা। তাড়াতাড়ি টাকাটা দাও! শিশুপাল-বধ যজ্ঞে আহতি দিতে হবে।’

—‘শিশুপাল বধ যজ্ঞ! কী সব বলছিস তুই!’

—‘আচ্ছা না হয় কীচক-বধ পালাই হল। দাও টাকাটা।’

—‘তোমার একটা কথাও বুঝি না বাপু! আসল কথা বল। তায়ইমশাইকে বোঝাতে পারলি?’

—‘তায়ইমশাই মানে ঐ বুড়োটা তো? ওর ভীমরতি সারবার নয়! বাহাভুরে ধরেছে আর কি।’

—‘তাহলে?’

—‘পারি না আর বকবক করতে!’

—‘বেশ, নে বাপু!’

রাগ করেই টাকা কটা বার করে দেন কাকিমা। আর সেটা পকেটস্থ করেই বেরিয়ে যায় হেবো। চুনোপুঁটি তো নয়, ঘাই-মারা রাঘব-বোয়াল সে ছিপে গেঁথে তুলতে চায়। সুতোয় জোর থাকা চাই; টোপটা শুধু লোভনীয় নয়, নিখুঁতও হওয়া চাই। একটু সন্দেহ হলেই রাঘব-বোয়াল টোপ ঠুকরে ফিরে যাবে—কপাৎ করে গিলবে না।

কৃষ্ণনগরে ফিরে আসে হেবো সেই রাত্রেই।

পরদিন, অর্থাৎ বৃহস্পতিবার, ডাক্তারবাবু যখন সুধাকান্তকে দেখতে এলেন তখন গুরুদেব বাড়ি ছিলেন না। হেবো গুটিগুটি ঢুকল ঐ ঘরে। সুধাকান্ত বেশ সুস্থই আছেন। উঠে বসেছেন তিনি। হেবো তাঁর বালিশটা ঠিক করে দেবার অছিলায় দেখে নিল, বালিশের নিচে লোহার সিন্দুকের চাবির খোকাটা আছে। আর আছে একটা খাম, মুখটা ছেঁড়া। দেখেই বুঝতে পারে, এর গর্ভেই ছিল আগেকার উইলটা। তার মানে, আগেকার উইলটা ছিঁড়ে ফেলা হয়েছে। ডাক্তারবাবু বলেন, ‘ব্লাড-প্রেসার দেখার যন্ত্রটা নিচে আমার গাড়িতে আছে। নিয়ে এস তো!’

হেবো শুনতে না পাওয়ার ভঙ্গি করে জানলার দিকে সরে যায়। জানলার পাশেই সুধাকান্তের লেখবার টেবিল। কিছু ফাইলপত্র, কাগজচাপা, বই, কলমদানিতে কলম, ব্লটার ইত্যাদি সাজানো। হেবো সরে যায় টেবিলের দিকে।

হেবো শুনতে পায়নি মনে করে কেবলানন্দই নিচে নেমে যায় রক্তচাপ মাপবার যন্ত্রটা আনতে। মিনিট আড়াই-তিন লাগবে ওর ফিরে আসতে, এর মধ্যেই হেবোকে হাতসামাই করতে হবে; কিন্তু সুধাকান্ত জেগে বসে আছেন। ডাক্তারবাবুও এদিকে ফিরে বসে আছেন। তবু শেষ চেষ্টা করবে হেবো।

হ্যাঁ, তিন মিনিটের মধ্যেই কেবলানন্দ ফিরে এল বাস্কাটা নিয়ে। পরীক্ষা করে ডাক্তারবাবুর মুখটা গম্ভীর হয়ে যায়।

সুধাকান্ত বলেন, ‘কী হে ডাক্তার, অত গোমড়া মুখ করলে কেন? সময় কি একেবারেই ফুরিয়ে এসেছে?’

—‘না না, তা কেন? তবে প্রেশারটা হঠাৎ খুব বেড়ে গিয়েছে। রাত্রে ঘুম হয়েছিল?’

সে প্রশ্নের জবাব না দিয়ে সুধাকান্ত বলেন, ‘আর চব্বিশ ঘন্টা টিকব তো?’

—‘সে কি কথা? অনেক দিন বাঁচবেন এখনও!’

—‘বাজে কথা বোলো না ডাক্তার। আমার যথেষ্ট বয়েস হয়েছে। সবই বুঝছি আমি। কিন্তু বিষয় সম্পত্তির একটা বিলি ব্যবস্থা না করে যেতে পারলে মরেও আমি শান্তি পাব না। আগামীকাল আমি উইল করব স্থির করেছি। তাই বলছি, আজ রাত্রের মধ্যে কিছু হবে না তো?’

ডাক্তারবাবু বুঝতে পারেন এই প্রবীণ বিচক্ষণ ব্যক্তিটির কাছে গোপন করার কিছু নেই। বলেন, ‘না, সে-রকম কিছু ভয় করার নেই।’

—‘তাহলেই হল। বেশ, কাল তাহলে এই সময় এসে আমার উইলে সাক্ষী হিসেবে একটা সই দিয়ে

যেও। আমি যে সুস্থ মনে এ উইল করেছি তার একটা প্রমাণ থাকা দরকার। ডাক্তারের সইটা থাকা ভাল।’

ডাক্তারবাবু গম্ভীর হয়ে বললেন, ‘আসব।’

হেবো ইতিপূর্বেই তার নোটবইতে ২(ক) সূত্রটা কেটে দিয়েছিল গুরুদেব টেলিগ্রাম করেছেন শুনে। এখন মনে মনে ২(খ) সূত্রটাও কেটে দিল। একে একে সব সম্ভাবনাগুলিই নির্মূল হয়ে যাচ্ছে।

যন্ত্রপাতি গুছিয়ে নিয়ে ডাক্তারবাবু বিদায় নেন।

হেবো ঠাকুর-দেবতাকে বড় বেশি ভাকে না। পরীক্ষার ঠিক আগে তাঁদের মনে পড়ে বটে—কিন্তু বছরের আর বাকি কটা দিন তাঁদের কথা বিশেষ মনে থাকে না। আজকের দিনটা কিন্তু ব্যতিক্রম। ডাক্তারবাবু চলে যেতেই সে ছুটে চলে আসে তার ঘরে। দরজায় খিল দিয়ে হাঁটু গেড়ে বসে পড়ে। মনে মনে বলে, ‘হে মা কালী! তুমিই বল, আমি কি কিছু অন্যায় করছি? আমি নিত্য ডাকাডাকি করে তোমার বিশ্রামে ব্যাঘাত ঘটাই না—আর ঐ গুরুদেব রোজ সকাল-সন্ধ্যা তোমাকে পাঁঠার মাংস খাওয়াতে চায়। কিন্তু তাই বলেই কি তুমি ও-দলে যোগ দেবে? যে টোপ পেতে এলাম, ঐ রাঘব-বোয়াল যেন সেটা গিলে ফেলে—এটুকুই তুমি কোরো মা! বাকি খেলিয়ে তোলার দায়িত্ব আমার। আর ওকে দিয়ে যদি টোপটা তুমি না গেলোও, তবে বলব তুমি মিথ্যে, তুমি মিথ্যে, তুমি মিথ্যে!’

* * *

শুক্রবার সকালে হেবোর ঘুম ভাঙল একটা চোঁচামেচিতে। কাল রাত্রে নাকি বাড়িতে চোর এসেছিল। কী আশ্চর্য! স্বয়ং শার্লক হেবো যে বাড়িতে উপস্থিত সে বাড়িতে চোর? অথচ হেবো রাত্রে কিছু টেরই পায়নি? সকালবেলা কেবলানন্দ প্রথম লক্ষ করে, সিঁড়ির দরজাটা খোলা। গুরুদেব ঘরের দরজা খুলে শোন দক্ষিণা বাতাসের লোভে। হেবোও দরজা খুলে শোয়। সুধাকাস্তের ঘর অবশ্য ভেতর থেকে বন্ধ থাকে। সে ঘরে মেঝেতে শোয় কেবলানন্দ। পরীক্ষা করে দেখা গেল চোর একতলা থেকে কিছুই সরায়নি, দোতলার দুটি ঘর থেকেই মাল সরিয়েছে। হেবোর সুটকেস নেই, গুরুদেবের ঝোলাটিও নেই। গুরুদেব দারোয়ানকে ডেকে প্রচণ্ড ধমক দিলেন। ‘সে হালপ করে বলল—বাইরের থেকে চোর আসেনি, কারণ সে জেগেই ছিল। কিন্তু বাইরের লোক ছাড়া আর কে চুরি করতে পারে? পুলিশে খবর দেওয়া হবে কিনা স্থির করার আগেই ঠাকুর এসে খবর দিল, বাগানের ভেতর ভাঙা সুটকেস ও ঝোলা পাওয়া গিয়েছে। আবার নতুন করে হিসাব নেওয়া গেল। না, বেশি কিছু খোয়া যায়নি। হেবোর গিয়েছে একটি টেরিলিনের শার্ট আর গোটা-কুড়ি টাকা। গুরুদেবের বুলির সব কিছুই প্রায় পাওয়া গিয়েছে। দামী কিছুই ছিল না ওতে। দুটো জিনিস একটু দামী ছিল—দুটোই বেহাত হয়েছে। একটা রূপোর কোশাকুশি আর একটা শেফার্স কলম।

হেবো থানায় যাবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিল, কিন্তু গুরুদেব বাধা দিলেন। বললেন, ‘যা গিয়েছে তা তো পাওয়া যাবেই না, উপরন্তু ঠাকুরটাকে ধরে নিয়ে যাবে ওরা। আজ কলকাতা থেকে বিশিষ্ট অতিথি আসছেন—ঠাকুর না থাকলে মহা মুশকিল।’

মঞ্জুলা দেবীও সায় দিলেন সে কথায়।

হেবো জনান্তিকে মঞ্জুলা দেবীকে বলে, ‘আসল কথা গুরুদেবের ভয় হয়েছে, কেঁচো খুঁড়তে সাপ বেরবে। পুলিশের খাতায় হয়ত তাঁর নাম আছে, হয়ত তাঁকেই হাজতে পুরবে পুলিশ!’

মঞ্জুলাদেবী তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে হেবোর দিকে তাকিয়ে বলেন, ‘তাই কি কাল রাত্রে চোর এসেছিল?’

হেবো বলে, ‘তার মানে?’

—‘তার মানে, তোমার কোনো কারসাজি নয় তো?’

হেবো বলে, ‘কী যে বলেন! আমারও তো জিনিস খোয়া গিয়েছে।’

যাই হোক শেষ পর্যন্ত পুলিশে খবর দেওয়া হল মা।

বেলা বাড়ল। বেলা দশটা নাগাদ এসে পৌঁছলেন অ্যাডভোকেট জি. এন. দে। সম্মানে তাঁকে ওপরের ঘরে নিয়ে গেলেন গুরুদেব। চা-জলখাবারের পর্ব মিটলে বুলডগটাকে দরজার বাইরে বসিয়ে ওঁরা অর্গলবদ্ধ ঘরে পরামর্শে বসলেন। হেবো নিজের ঘরে গিয়ে দরজায় খিল লাগালো। মাঝের

দরজার চাবির ফুটোতে চোখ লাগিয়ে কিছুই দেখতে পেল না। কান লাগিয়ে বরং দু-একটা কাটা-কাটা কথা শোনা গেল। অ্যাডভোকেট-সাহেব বলছেন, ‘এবার ড্রাফটখানা নিখুত হয়েছে; আমি ফেয়ার কপি করে ফেলি।’

সুধাকান্ত বাধা দিয়ে বলেন, ‘না, ফেয়ার কপিটা আমি নিজে হাতে লিখব। আজ বেশ সুস্থ আছি আমি।’

গুরুদেব বললেন, ‘কিন্তু তাতে কি কষ্ট হবে না তোমার?’

সুধাকান্তের হাসিটা চোখে না দেখতে পেলেও অনুভব করে হেবো। তিনি হেসে বলেন, ‘কষ্ট হলেও উপায় নেই। আইনের খঁত আমি রাখব না। অদ্যোপান্ত হাতের লেখাটা আমার হলে আইনগত তার মর্যাদা বাড়বে—না কি বলেন দে-সাহেব?’

দে-সাহেবের জবাবটা শোনা গেল না; কিন্তু সুধাকান্তের পরবর্তী বক্তব্যটা শোনা যায়—‘দয়া করে আমার ঐ কলমটা দেবেন? নিজের কলম ছাড়া লিখতে পারি না আমি।’

প্রায় মিনিট পনের পরে নিচে গেটের সামনে একটা মোটর গাড়ি এসে দাঁড়াল। কেবলানন্দ হস্তদস্ত হয়ে উঠে এল সিঁড়ি বেয়ে। বন্ধ ঘরে টোকা দিয়ে বলল, ‘ডাক্তারবাবু এসেছেন।’

হেবোও বেরিয়ে এল ঘর থেকে। দেখে নকুলচন্দ্র আর ডাক্তারবাবু সিঁড়ি দিয়ে ওপরে আসছেন। ওঁদের পেছনে পেছনে ঢুকে পড়ে রোগীর ঘরে। রোগী আজ বেশ প্রফুল্ল। বলেন, ‘ডাক্তার আমাকে আজ বেশ ভাল করে পরীক্ষা করে দেখ দিকি।’

—‘কেন? হঠাৎ আজ ভাল করে পরীক্ষা করতে হবে কেন?’

—‘আমি সুস্থ স্বাভাবিক মানসিক অবস্থায় আছি কিনা, দেখে বল।’

—‘ও! উইলটা করেছেন বুঝি?’

—‘হ্যাঁ, একটা সইও দিতে হবে তোমাকে। নকুল, তুমিও দেবে।’

ডাক্তারবাবু রোগীকে পরীক্ষা করেন। তারপর কোনো কথা না বলে উইলখানা টেনে নেন। সমস্তটা ধৈর্য ধরে পড়ে কাগজখানা ফিরিয়ে দেন সুধাকান্তবাবুকে। গভীর কণ্ঠে বললেন, ‘আমাকে আপনি মাপ করবেন সুধাকান্তবাবু, আমি এ উইলে সাক্ষী থাকতে পারব না। এ অনুরোধ করবেন না আপনি।’

একটু রক্ষ স্বরে সুধাকান্ত বলেন, ‘কেন? কারণ কী?’

—‘আপনি আমার চেয়ে বয়সে বড়, আপনাকে শ্রদ্ধা করি আমি। তবু বলতে বাধ্য হচ্ছি, এ আপনি অত্যন্ত অন্যায় করছেন।’

রক্ষতর স্বরে সুধাকান্ত বলেন, ‘কিন্তু সে বিচারের ভার তো তোমার ওপর নেই ডাক্তার! তুমি ভিজিট নিয়ে আমাকে দেখতে এসেছ। আমি যে স্বাভাবিক অবস্থায় আছি তার সার্টিফিকেট আমি আইনত দাবি করতে পারি।’

—‘না, পারেন না; কারণ আজকের ভিজিট আমি নেব না।’

বাক্স গুছিয়ে উঠে পড়ার উপক্রম করেন ডাক্তারবাবু।

হেবো মুহূর্তমাত্র কালবিলম্ব না করে ছুটে যায় নিচে। মঞ্জুলা দেবীকে খুঁজে বের করে তাঁর হাতদুটি চেপে ধরে—‘সর্বনাশ হয়েছে কাকিমা, একটা কাজ করতেই হবে আপনাকে! যেমন করে হোক!’

—‘কী হয়েছে? অমন করছ কেন তুমি?’

—‘ডাক্তারবাবু উইলে সাক্ষী হতে অস্বীকার করেছেন। যেমন করে পারেন তাঁকে রাজি করান!’

কেন, কী বৃত্তান্ত কিছুই প্রশ্ন করেন না মঞ্জুলা দেবী। বলেন, ‘বেশ সেই ব্যবস্থাই করছি।’

ঘর থেকে বেরিয়ে এসে দেখেন ডাক্তারবাবু গটগট করে নেমে আসছেন দোতলা থেকে। মাথায় আঁচলটা তুলে দিয়ে এগিয়ে আসেন মঞ্জুলা দেবী। বলেন, ‘একটা কথা ভিন্ ডাক্তারবাবু।’

—‘বল মা।’

—‘আপনি আপত্তি করবেন না। উইলে আপনি সই দিয়ে আসুন।’

জ-দুটি কুঁচকে ওঠে ডাক্তারবাবুর, বলেন, ‘কিন্তু কেন বল তো মা? উইল তুমি দেখেছ?’

মঞ্জুলা বলেন, ‘না, দেখিনি। তবে আন্দাজ করতে পারি। আমাদের বিষয় থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে। এই তো?’

—‘হ্যাঁ, তাই। এতে আমাকে সই দিতে বলছ কেন?’

হেবো ভাবে, এইবার মঞ্জুলা দেবীর আর কোনো জবাব নেই। বস্তুত তার মতো উপস্থিত-বুদ্ধি-ওয়াল ছেলের মাথাতেও কোনো ফন্দি বার হল না। কিন্তু হেবো জানত না যে, যারা নিছক সরল ও সহজ তারা অনেক বাধাবিঘ্ন এড়িয়ে যেতে পারে তাদের সারল্যের জন্যেই। যে জবাব হেবোর মুখে জোগায়নি, মঞ্জুলার মুখে তাই জোগাল, আর, সেটা কোনো ফন্দি নয়। তাঁর আন্তরিক কৈফিয়তই।

মঞ্জুলা শান্ত অথচ দৃঢ় কণ্ঠে বললেন, ‘আপনি সই না দিলে অন্য কোনো ডাক্তারে তা দেবে। শহরে ডাক্তারের অভাব নেই। কিন্তু যতক্ষণ ঐ উইল-পর্ব শেষ না হচ্ছে, ততক্ষণ ওঁরা আমাকে বাবার কাছে যেতেই দেবেন না। শেষ সময়ে ওঁর কোনো সেবা-যত্নই হচ্ছে না। খোকার বাবা নিশ্চয়ই স্বর্গে থেকেও এজন্য শাস্তি পাচ্ছেন না। সম্পত্তি আমি এমনিও পাব না, অমনিও নয়—অন্তত শ্বশুরের শেষ সময়ে সেবা করার অধিকারটুকু আপনি আমাকে দিয়ে যান, ডাক্তারবাবু!’

অনেকক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে থেকে ডাক্তারবাবু বলেন, ‘তোমার এ কথায় ঈশ্বরের ওপর বিশ্বাস হারিয়ে ফেলছি মা! এমন মেয়েরও সর্বনাশ করেন তিনি? কিন্তু তোমার কথাই ঠিক। ও সম্পত্তি তুমি অমনিতেও পাবে না। নির্মলকে আমিও স্নেহ করতাম। তার আত্মাকে তৃপ্তি দাও তুমি। আমি সই দিয়ে আসছি। ভগবান তোমার মঙ্গল করুন!’

সিঁড়ি বেয়ে আবার ওপরে উঠে যান তিনি।

হেবো স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে। নকুলচন্দ্রও সই দিলেন, সেটা পরে জানতে পেরেছিল হেবো।

সব খবর শুনে সন্ধ্যাবেলায় মাথায় হাত দিয়ে বসলেন প্রবীরচন্দ্র। হেবো বললে, ‘কিছু ঘাবড়াবেন না। ঐ উইল নির্যাত চুরি যাবে। ফাঁদ পেতে এসেছি আমি।’

প্রবীরচন্দ্র ঠিক বিশ্বাস করে উঠতে পারেন না।

* * *

পরদিন। শনিবার সকাল। গতরাত্রের শেষ দিকে সুধাকান্তের আবার একটা আক্রমণ হয়েছে। যেন উইলটাতে সই করার জন্যেই তিনি মনের জোরে সুস্থ ছিলেন এতদিন। উইল সম্পাদন করার সঙ্গে সঙ্গেই এসেছে মানসিক অবসাদ, অমনি শয্যা নিলেন তিনি। শেষরাত্রে আক্রমণটা হয়েছে, অথচ বাড়ির কেউ জানতে পারেনি। পারবে কোথা থেকে? ওঁর ঘরে থাকে কেবলানন্দ। আর কারো সে ঘরে ঢোকা মানা। কেবলানন্দ রাত-ভোর নাক ডাকিয়ে ঘুমিয়েছে, সকালে সে উঠে জানতে পেরেছে। তাই সাত-সকালোই সোরগোল পড়েছে বাড়িতে। মঞ্জুলা দেবী খবর পেয়ে ছুটে এলেন ওপরে। রোগীর ঘর খোলাই ছিল। সুধাকান্ত অচেতন্য অবস্থায় পড়ে আছেন। মঞ্জুলা আর হেবো ঘরে ঢুকতেই গুরুদেব গর্জন করে ওঠেন, ‘আবার তুমি এসেছ ওপরের ঘরে? কতদিন না বারণ করেছি। বলেছি না, এ ঘরে আসবে না’?

হঠাৎ কী হল মঞ্জুলার! কোথা থেকে দুর্জয় সাহস এল ওঁর মনে। দৃপ্তভঙ্গিতে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে দরজার দিকে আঙুল দেখিয়ে শুধু বললেন, ‘বেরিয়ে যান বলছি!’

একেবারে থতমত খেয়ে যান গুরুদেব। নিজের কানকেই যেন বিশ্বাস করতে পারছেন না। আমতা-আমতা করে বলেন, ‘কী, এত বড় সাহস!’

মঞ্জুলা হেবোকে বলেন, ‘দারোয়ান আর গঙ্গারামকে ডাক তো হেবো, এ দুটো লোককে রোগীর ঘর থেকে বার করে দিতে হবে!’

কাঁপতে কাঁপতে খাট থেকে উঠে দাঁড়ান গুরুদেব। কী করবেন, কী বলবেন স্থির করে উঠতে পারেন না। কেবলানন্দ বাঘের মতো থাবা গেড়ে বসে আছে—যেন আদেশ পেলেই ঝাঁপিয়ে পড়বে। মঞ্জুলা এগিয়ে যান সুধাকান্তের মাথার কাছে। বালিশের তলা থেকে লোহার সিন্দুকের চাবিটা তুলে নিয়ে ছুঁড়ে দেন গুরুদেবের দিকে, বলেন, ‘এর জন্যেই প্রাণটা পড়ে আছে তো এ-ঘরে? যান, ওটা নিয়ে চলে যান! বাবার মৃত্যু হলে তখন সম্পত্তির দখল নিতে আসবেন। কিন্তু তার আগে ফের যদি এ ঘরে পা বাড়ান, দারোয়ান দিয়ে আপনার ঠ্যাং ভেঙে দেব আমি! যান বলছি!’

অবাক কাণ্ড! অমন প্রবল-প্রতাপাশ্রিত গুরুদেব যেন একেবারে কেঁচোটাই হয়ে গিয়েছেন। চাবির গোছাটি তুলে নিয়ে গুটিগুটি বেরিয়ে যান ঘর থেকে। পোষ-মানা কাবলি বেড়ালের মতো কেবলানন্দ যায় তাঁর পিছু-পিছু।

হেবো এগিয়ে এসে মঞ্জুলা দেবীকে প্রণাম করে।

—‘কী হল রে? হঠাৎ প্রণাম কিসের?’

—‘সে আমি বোঝাতে পারব না!’

—‘শোন। এক কাজ কর। ডাক্তারবাবুকে খবর দে।’

কিন্তু ডাক্তারবাবুকে খবর দিয়েও কিছু লাভ হল না।

ডাক্তারবাবু রোগীকে পরীক্ষা করে বললেন যে আর বড় জোর দু-দিন। এ দু-দিন মঞ্জুলা প্রাণ ঢেলে শ্বশুরের সেবা করলেন। দুর্ভাগ্য সুধাকান্তের। পুত্রবধূর সেবা যে তিনি পেলেন, তা জানতেও পারলেন না। সমস্ত দিনরাত্রির মধ্যে মঞ্জুলা একবারও বার হলেন না ঘর ছেড়ে।

গুরুদেবেরও কী হল, এ ঘরে একবারও মাথা গললেন না। পরের দিন কাউকে কিছু না বলে গুরুদেব কোথায় চলে গেলেন তাঁর ঝোলাঝুলি নিয়ে। কেবলানন্দ রয়ে গেল।

হেবো বললে, ‘কাকিমা, এবার একবার শেষ চেষ্টা করতে হয়। ওঁর ঘরটা একবার খুঁজে দেখতে চাই, চাবিটা পাওয়া যায় কিনা। উইলটা নিশ্চয় ঐ সিন্দুকেই আছে।’

মঞ্জুলা বলেন, ‘ওসব থাক হেবো। একটা মরণাপন্ন মানুষের শিয়র থেকে তাঁর উইল চুরি করতে পারব না আমি।’

—‘আরে, আপনাকে চুরি করতে কে বলছে? যা করবার তা আমিই করব।’

—‘না! তাঁর শেষ ইচ্ছায় বাধা দেবার কোনো অধিকার ধর্মত আমার নেই।’

হেবো ধমকে ওঠে, ‘খামুন তো আপনি! এই যদি ধর্ম হয়, তবে অধর্ম বলে দুনিয়ায় কিছু নেই! আপনাকে কিছু করতে হবে না। শুধু কেবলানন্দকে ঘন্টাকয়েকের জন্য এখান থেকে সরিয়ে দিন।’

—‘তা কেমন করে সরাব আমি?’

—‘ওর হাতে পাঁচটা টাকা দিয়ে বলুন ‘আনন্দময়ীতলায় আপনার শ্বশুরের নামে পূজো দিয়ে আসতে।’

—‘আনন্দময়ীতলাটা আবার কোথায়?’

—‘বড় জাগ্রত কালী এখানকার। কেবলানন্দ জানে। মায়ের নামে পূজো দেওয়ার কথায় বেটা না বলতে পারবে না। রিকশা করে গেলেও ঘন্টাদুয়েক সময় পাওয়া যাবে।’

উইল চুরি করার ব্যাপারে কোনো উৎসাহ না থাকলেও ‘আনন্দময়ী মায়ের নামে পূজো পাঠানোতে মঞ্জুলার আগ্রহ ছিল। কেবলানন্দকে সহজেই সরানো গেল।

তৎক্ষণাৎ কাজে লেগে গেল হেবো। গুরুদেবের ঘরের প্রত্যেকটি স্থান, প্রত্যেকটি কোনা তন্নতন্ন করে খুঁজতে শুরু করল। বাবাজির একটা ঝোলা আছে, একটি টিনের সুটকেস আছে। তালাবন্ধ নয়। খোলাই। তাড়াতাড়ি করে খুঁজে দেখল হেবো। কা কস্য পরিবেদনা। চাবির থোকা কোথাও নেই।

মঞ্জুলা দেবী এসে বলেন, ‘কী পাগল ছেলে তুমি হেবো! গুরুদেব কখনো চাবিটা এ বাড়িতে রেখে যান? সঙ্গে নিয়েই গিয়েছেন তিনি।’

হেবো গম্ভীর হয়ে বললে, ‘না, কাকিমা। গোয়েন্দাগিরি যদি একটুও শিখে থাকি তবে নিশ্চিত জানি সেটা তিনি নিয়ে যাননি। এ বাড়িতেই কোথাও লুকিয়ে রেখে গিয়েছেন।’

মঞ্জুলা বলেন, ‘অসম্ভব!’

—‘অসম্ভবই মনে হচ্ছে আপনার। তা-ই হওয়ার কথা; কিন্তু আমার এ সিদ্ধান্ত সুযুক্তির বিশ্লেষণে সুপ্রতিষ্ঠিত। চাবি আমি খুঁজে পাবই।’

হয়ত ঠিক কথাই বলেছেন মঞ্জুলা। গুরুদেবের ঘরটা তন্নতন্ন করে খুঁজেও চাবির থোকা পাওয়া গেল না। হেবো একটু অবাক হল। এমন তো হওয়ার কথা নয়! তার কি হিসাবে ভুল হল কোথাও? তা হওয়ার কথা নয়! গুরুদেব তো চাবি নিয়ে যেতে পারেন না। তবে কি তিনি আরও কঠিন কোনো চাল চলেছেন?

ভাবতে ভাবতে নিজের ঘরে ফিরে আসে হেবো। আচ্ছা, এমনও তো হতে পারে, উনি চাষিটা হেবোর ঘরেই রেখে গিয়েছেন? একবারে বাঘের ঘরে যদি ঘোগের বাসা হয়ে থাকে? যদি উনি ভেবে থাকেন হেবো সারা বাড়ি খুঁজবে, কিন্তু নিজের ঘরটা খুঁজবে না?

কী আশ্চর্য! যা ভেবেছে তাই। হেবোর ঘরের ভেতর থেকেই উদ্ধার করা গেল চাবির থোকাটা। ওপরের একটা কুলুঙ্গিতে পুরনো বইয়ের পেছনে একটা ভাঙা লক্ষ্মীর ঝাঁপির ভেতর থেকে বার হল সেটা। কী ধড়িবাঁজ লোক! একনশ্বরের ঘড়েল! কোনো সুযোগে হেবোর অলক্ষিতে তারই ঘরে চাষিটা লুকিয়ে রেখে গিয়েছে!

তৎক্ষণাৎ সুধাকান্তের ঘরে চলে আসে হেবো। কেবলানন্দের ফিরতে এখনো দেরি আছে। মঞ্জুলা দেবী রোগীর জন্য পথ্য তৈরি করতে নিচে গিয়েছেন। ঘরে আর কেউ নেই। সুধাকান্ত অচৈতন্য। দরজাটা বন্ধ করে দেয় প্রথমে। দ্রুতগতি লোহার সিন্দুকটা খুলে ফেলে হেবো। হ্যাঁ, সামনেই রয়েছে সীলমোহরাক্ষিত খামটা। সেটা বের করে হেবো আবার সিন্দুকটা বন্ধ করে! খামটা পকেটে ফেলে আবার চাষিটা রেখে আসে সেই ভাঙা লক্ষ্মীর ঝাঁপিতে। আর কালবিলম্ব না করে হেবো তৎক্ষণাৎ বেরিয়ে পড়ে কলকাতার উদ্দেশ্যে। এবার কাকা-কাকিমার হাতে উইলটা জমা দিতে হবে। বাবা-মা হয়ত মধুপুর থেকে ফিরে এসেছেন। সোমবার থেকে স্কুলও খুলবে। আর দেরি করা উচিত নয়। কাজ যখন হাসিল হয়ে গেল তখন ফিরে যাওয়াই ভাল।

* * *

কাকা-কাকিমা ওকে দেখে বলেন, ‘কিরে হেবো, কী খবর?’

হেবো বললে, ‘ওয়া গুরুজীকি ফতে!’

—‘তার মানে?’

—‘তার মানে এই সেই অপয়া উইল! যত্ন করে রেখে দাও!’

—‘সে কী রে? কেমন করে পেলি?’

—‘সে অনেক কথা। সুধাকান্তবাবু এখন অচৈতন্য। ডাক্তার বলেছেন আর তাঁর জ্ঞান ফিরবে না। সুতরাং নতুন করে উইল আর করতে পারবেন না। ব্যস, খেল্ খতম!’

কাকিমা বলেন, ‘কিন্তু ওটাকে যত্ন করে রেখে কী লাভ? পুড়িয়ে ফেলি বরং ওটাকে!’

কাকা বলেন, ‘না না, তার আগে খুলে দেখি ওটাই সেই আসল উইল কিনা!’

হেবো বললে, ‘এখন নয় কাকা! গুরুদেবকে দেখিয়ে দেখিয়ে, তার চোখের সামনেই ওটাকে না পোড়ালে আমার গায়ের ঝাল মিটবে না! বেটা বলে কিনা, বজ্জাত বোম্বেষ্টে শয়তান!’

কাকিমা হেসে ওঠেন, ‘কাকে বলেছে রে? তোকে?’

—‘আমাকে বললে তখনই তার নাকটা ভেঙে দিতাম না! বলেছে অন্য একটা ছেলেকে।’

—‘তবে তুই অত চটছিস কেন?’

—‘সে অনেক কথা।’

—‘প্রবীরের খবর কী?’

হেবো চমকে উঠে বলে, ‘ঐ যাঃ! তাঁকে তো খবর দিয়ে আসা হয়নি! নাঃ! এটা অত্যন্ত অন্যায় হয়েছে আমার! কাকা, আমি আর একবার যাই বরং!’

—‘তা যা। তবে কালকেই ফিরে আসিস। দাদারাও কাল সন্ধ্যায় ফিরে আসছেন। প্রবীর বেচারাকে খবরটা এখনই দেওয়া দরকার।’

হেবো আবার রওনা হয়ে পড়ে কৃষ্ণনগর যাবে বলে।

কিন্তু দুর্ভাগ্য হেবোর, কৃষ্ণনগরে গিয়ে সে প্রবীরকাকুর দেখা পেল না। কারণ হেবো রওনা হওয়ার কয়েক ঘণ্টা পরেই সুধাকান্ত মারা গেলেন। প্রবীরচন্দ্র খবর পেয়ে হেবোর খোঁজে এসেছিলেন, এবং হেবো কলকাতা চলে গিয়েছে শুনে তিনিও চলে এলেন হেবোদের বাড়িতে।

প্রবীরচন্দ্র যখন পৌঁছিলেন তার আগেই হেবো রওনা হয়ে গিয়েছে। প্রবীরচন্দ্রের কাছে সংবাদ পেয়ে হেবোর কাকা ও কাকিমাও কৃষ্ণনগরে যাবার জন্য প্রস্তুত হলেন। প্রবীরচন্দ্র হেবোর উইল চুরির

কথা শুনে রীতিমত অবাক হয়ে গেলেন। বললেন, ‘এ হতেই পারে না! আমি বিশ্বাস করতে রাজি নই যে, ঐ ঘড়েল শিরোমণি লোহার সিন্দুকে উইল রেখে বাড়ি ছেড়ে চলে যাবে—আর যাওয়ার সময় সেই চাবির খোকাটা রেখে যাবে হেবোর ঘরেই। হেবোর মতো পাকা ছেলে এ কথা বিশ্বাস করল কেমন করে?’

কাকিমা বলেন, ‘কিন্তু সে যে উইলটা রেখে গেল আমার কাছে!’

হো-হো করে হেসে উঠে প্রবীরচন্দ্র বলেন, ‘নিয়ে আসুন সেখানা, খুলে দেখুন ভেতরে কী মাল আছে! ওখানা আসল উইল নিশ্চয় নয়। হেবোকে ধোঁকা দেওয়ার জন্য ওখানা ঐ হতভাগা বোম্বটে ওখানে রেখে গিয়েছে। আসল উইল সে সঙ্গে নিয়েই গিয়েছে।’

হেবোর কাকা বলেন, ‘আমারও তাই সন্দেহ হয়েছিল।’

বাধা দিয়ে প্রবীর বলেন, ‘সন্দেহ হয়েছিল না ঘট! তাহলে এতক্ষণ সেটা খুলে দেখেননি কেন?’

—‘হেবোই তো বারণ করলে।’

—‘বাদ দিন ওসব ছেলেমানুষী! নিয়ে আসুন সেখানা।’

কাকিমা ভয়ে ভয়ে আলমারি খুলে বন্ধ খামটা নিয়ে আসেন। সীলমোহরগুলি পরীক্ষা করে প্রবীরবাবু বলেন, ‘সীল ঠিকই আছে তবে ভেতরে কী আছে জানেন?’

—‘সাদা কাগজ?’

—‘মোটাই নয়। ভেতরে আছে আসল উইলের একটা হুবহু কপি। শুধু, সইগুলো জাল। বোটা জানে যে হেবো এটা চুরি করবে এবং পুড়িয়ে ফেলবে। তারপর সুধাকান্তের মৃত্যু হলে আমরা যখন বলব তিনি কখনও কোনো উইল করেননি, তখন সকলের নাকের ওপর আসল উইলখানা মেলে ধরবেন তিনি।’

কাকা বলেন, ‘তবে এখানা খুলে দেখি?’

—‘নিশ্চয়ই!’ বলে প্রবীরচন্দ্র খুলে ফেলেন খামটা। কাগজের ভাঁজটা খুলে মুখটা লাল হয়ে যায় তাঁর। তাঁর অনুমান সত্য হয়নি। কাগজখানা মেলে ধরেন তিনি। কাগজটায় লেখা ছিল—

—‘দুঃখ কোরো না বাবা হেবো—খুড়ি বটুক! হেলে ধরতে হাত পাকিয়েছ বলে কেউটার গর্তে হাত দিতে যেও না। উইলটা সিন্দুকে রেখে যাওয়া নিরাপদ নয় মনে করে সেটা সঙ্গে করেই নিয়ে গেলাম। পবুকে দুঃখ করতে বারণ কর।’

কাকা চিৎকার করে ওঠেন—‘ছি ছি ছি! হেবোটা একটা আস্ত গাড়োল!’

প্রবীর বলেন, ‘আপনারাও কিছু কম যান না!’

মুখ কালো করে বসে থাকেন কাকা।

কাকিমা বলেন, ‘সে যা হবার হয়েছে। তোমাদের বুদ্ধি যে কত তা বোঝা গিয়েছে! একরত্তি একটা ছেলেকে ঠেলে দিয়ে এখানে বসে সবাই লাজ নাড়ছ! এতক্ষণে বোধহয় মঞ্জুলাকে ঐ গুরুদেব হাত ধরে পথে বার করে দিয়েছে! চল তাকে নিয়ে আসবার ব্যবস্থা করি।’

অগত্যা কাকা-কাকিমা আর প্রবীরচন্দ্র ভগ্নহৃদয়ে রওনা হলেন কৃষ্ণগরের উদ্দেশ্যে।

* * *

সুধাকান্তের বাড়িতে পৌঁছে দেখেন, রীতিমতো একটা জনসমাবেশ হয়েছে। সুধাকান্ত লব্ধপ্রতিষ্ঠ ব্যক্তি ছিলেন। শহরের গণ্যমান্য সকলেই এসে হাজির হয়েছেন। মৃতদেহ দাহ করে শ্মশানযাত্রীরাও ফিরে এসেছে।

বাইরের ঘরে বসে কথা হচ্ছে। গুরুদেব ইতিমধ্যে এসে জুটেছেন। হেবোও আছে। শহরের প্রবীণ উকিল গণেশবাবু বলছেন, ‘শহরে একটা ইন্দ্রপতন হয়ে গেল! সুধাকান্তবাবুর সওয়াল শুনতে বার অ্যাসোসিয়েশন ছেড়ে সবাই হুমড়ি খেয়ে পড়ত।’

‘অত্যন্ত ক্ষুরধার বুদ্ধি ছিল ওঁর,’ নবীন একজন উকিল বলেন, ‘অথচ সেই মানুষেরই শেষ অবস্থায় কী ভীষণ বুদ্ধিব্রংশ হল দেখুন।’

গণেশবাবু একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বলেন, ‘মুনিদেরও মতিভ্রম হয় হে ঘোষাল, তা সুধাকান্তবাবু তো সামান্য মানুষ।’

জগন্নাথবাবু বলেন, ‘কেন? মতিভ্রম কিসের?’

গণেশবাবু বলেন, ‘ও, আপনি বুঝি জানেন না? সুধাকান্তবাবু একেবারে শেষ অবস্থায় তাঁর উইল পালটিয়ে তাঁর বিধবা পুত্রবধূকে সম্পত্তি থেকে সম্পূর্ণ বঞ্চিত করে গিয়েছেন।’

জগন্নাথবাবুও নামকরা প্রবীণ উকিল, সুধাকান্তের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতা ছিল যথেষ্টই। তিনি বলে ওঠেন, ‘এ হতেই পারে না! কী নকুলবাবু, এ কথা কি সত্যি?’

নকুলবাবুর সঙ্গে হেবোর চোখাচোখি হয়। হেবোর সঙ্গে তাঁর বোধহয় আগেই কোনো কথা হয়ে থাকবে। তিনি অগ্নানবদনে বলে বসেন, ‘এঁরা অনেকে তাই বলছেন বটে, তবে আমার তা বিশ্বাস হয় না! তাহলে আমাকে তিনি নিশ্চয়ই বলে যেতেন।’

গুরুদেব ফোড়ন কাটেন, ‘অথবা সাক্ষী রাখতেন। আপনি কি তাঁর শেষ উইলে গত শুক্রবার সই করেননি?’

—‘শুক্রবার? কই? মনে তো পড়ে না।’

গুরুদেব হেসে বলেন, ‘আমি শুনেছি উইলে আপনারও সই আছে।’

নকুল বলেন, ‘ভুল শুনেছেন তাহলে।’

—‘তা হবে! হস্তরেখাবিদ সে কথা বলতে পারবে।’

হঠাৎ বাধা দিয়ে অ্যাডভোকেট দে-সাহেব বলে ওঠেন, ‘না। শেষ সময়ে অর্থাৎ গত শুক্রবার তিনি যে উইল করেছিলেন আমি সে উইলে সাক্ষী হিসাবে সই করেছি; আর—’

—‘আর?’

—‘আর, জানি না নকুলবাবু কেন অস্বীকার করছেন, তিনি আমার সম্মুখেই সাক্ষী হিসাবে সই দিয়েছিলেন।’

গণেশবাবু বলেন, ‘একি সর্বনাশের কথা মশাই! হ্যাঁ নকুলবাবু, ইনি কী বলছেন?’

নকুলবাবু আবার একবার হেবোর দিকে দেখে নিয়ে বলেন, ‘বেশ তো, উইলটা আনা হলেই বোঝা যাবে।’

হেবো ওপর-পড়া হয়ে বলে, ‘উইল করে থাকলে সুধাকান্তবাবু তা তাঁর লোহার সিন্দুকে রেখে থাকবেন, না কী বলেন গুরুদেব?’

গুরুদেব বলেন, ‘তা তো বলতে পারি না বাবা, তবে আমার কাছে ঐ সিন্দুকের চাবি আছে। খুঁজে দেখতে পার।’

চাবিটা তিনি দেন হেবোর হাতে।

হেবো হেসে বলে, ‘বেশ, আপনারাও তাহলে চলুন, সিন্দুকটা আমরা প্রথমে খুঁজে দেখি।’

প্রবীরবাবু বুঝতে পারেন হেবো একটা প্রচণ্ড ভুল করতে চলেছে। তাই হেবোকে ডেকে বলেন, ‘হেবো, শোন। তোমার সঙ্গে একটা জরুরি কথা ছিল।’

হেবো বললে, ‘আসছি প্রবীরকাকা, আগে সিন্দুকটা খুলে দেখে আসি।’

হেবোর কাকা প্রবীরচন্দ্রকে জনান্তিকে ডেকে বলেন ‘বাধা দিও না। যা হবার তা তো হয়েছেই। ওর ডেপোমির একটু শিক্ষা হওয়া উচিত।’

সদলবলে ওঁরা উপরে উঠে আসেন। হেবো ঝুঁকে পড়ে সিন্দুকটা খুলে ফেলে। ভেতরটা ভালো করে দেখে বলে, ‘কই উইল বলে তো কিছু মনে হচ্ছে না। গুরুদেব, আপনি একটু খুঁজে দেখবেন?’

গুরুদেব বলেন, ‘না বাবা। আমি তো বলিনি উইল ওখানে আছে। তুমিই বলেছিলে।’

‘তবে উইল কোথায় আছে?’ চালের মাথায় প্রশ্ন করে হেবো।

—‘আমার কাছে বাবা। এই দেখ।’

ঝোলার ভেতর থেকে ঠিক একই রকমের একখানি সীলমোহর করা খাম বার করে তিনি গণেশবাবুর হাতে দেন।

গণেশবাবু সেটি গ্রহণ করে বলেন, ‘এইটিই তাহলে সুধাকান্তের শেষ উইল?’

গুরুদেব হেসে বলেন, ‘আজ্ঞে হ্যাঁ। খুলে দেখুন। সমস্ত সম্পত্তিই তিনি দেবোত্তর করে গিয়েছেন। আমিই তার অছি। তিনজন সাক্ষী আছেন—এবং নকুলচন্দ্র তাঁদের মধ্যে একজন।’

গণেশবাবু বলেন, ‘নকুলবাবু?’

নকুলবাবুর চক্ষুস্থির হয়ে গেছে ততক্ষণে, আমতা-আমতা করে বলেন—‘হেবো!’

হেবো একেবারে পাথরের মূর্তি যেন। কথা নেই তার মুখে। গুরুদেব খুকখুক করে হেসে ওঠেন।

গণেশবাবু খামটা খুলবার উদ্যোগ করতেই হেবো বাধা দেয়। বলে, ‘এতই যদি হলো তবে গুরুদেব আপনিই খামটা খুলুন। উইলটা পড়ে শোনান আমাদের।’

গুরুদেবের চোখদুটো ধক করে জ্বলে ওঠে। বলেন, ‘বেশ, তাই পড়ে শোনাচ্ছি আমি।’

সাবধানে খামটা খুলে ফেলেন তিনি।

কাগজখানা বার করে ভাঁজটা খুলেই কিন্তু চমকে ওঠেন।

এপিঠ-ওপিঠ কয়েকবার দেখে একেবারে বজ্রাহত হয়ে যান।

অ্যাডভোকেট দে-সাহেব ঝুঁকে পড়েন কাগজটার ওপর। তারপর বলেন—‘এ কী!’

গুরুদেবের অবশ হাত থেকে কাগজখানা টেনে নিয়ে এপিঠ-ওপিঠ দেখে বলেন, ‘এ তো একখণ্ড সাদা কাগজ। উইল কই?’

গুরুদেব কোনো জবাব দেননা। গোল মুখখানা লম্বাটে হয়ে গিয়েছে তাঁর। চোয়ালের নিম্নাংশটা ঝুলে পড়েছে।

হেবো এবার খুকখুক করে হেসে ওঠে।

আর আত্মসংবরণ করতে পারেন না গুরুদেব। ধপ করে বসে পড়েন মাটিতে। গণেশবাবু ব্যস্ত হয়ে বলেন, ‘কী হল?’

হেবো তাড়াতাড়ি বলে, ‘আজ্ঞে জয়দ্রথ-বধ!’

* * *

সুধাকান্তের শ্রাদ্ধে বৃষোৎসর্গ করা হবে স্থির হল। মঞ্জুলা দেবী ঘটা করে শ্রাদ্ধ করতে চান। শ্বশুর তো তাঁর জন্য সম্পত্তি বড় কম রেখে যাননি! ভালো করেই খরচপত্র করতে মনস্থ করেছেন তিনি।

পরদিনই তল্লিতল্লা গুটিয়ে গুরুদেব রওনা হচ্ছেন শুনে হেবো ছুটে এল সিঁড়ির মুখে। দাঁড়িয়ে বললে, ‘আপনার শ্রাদ্ধের গুরুবিদায়টা নিয়ে যাবেন না স্যার?’

গুরুদেব শুধু বললেন, ‘জ্যাঠামো কোরো না!’

হেবো বললে, ‘অস্তত এ দুটো নিয়ে যান। খুঁজে পাওয়া গিয়েছে। এ দুটো আপনারই।’

হেবো বার করে দেয় একটা রূপোর কোশাকুশি আর একটা কলম।

গুরুবিদায় সমাপ্ত হতেই বাড়ির সকলে ঘিরে ধরল হেবোকে : কাকা, কাকিমা, মঞ্জুলা, নকুলচন্দ্র আর প্রবীর। দরজা বন্ধ করে সবাই মিলে চেপে ধরল হেবোকে। এবার বলতে হবে, কী করে কী হল।

প্রবীরচন্দ্র বলেন, ‘আমি যে কিছুই বুঝতে পারছি না!’

হেবো হেসে বললে, ‘কেন পারছেন না জানেন? আপনারা সবচেয়ে সহজ পথটা দেখতে পারছেন না। একটা উদাহরণ দিচ্ছি, তাহলেই সমস্যাটা সহজ হয়ে যাবে।’

—‘কী উদাহরণ?’

—‘আপনাকে তিনটে বানান জিজ্ঞাসা করব। ঠিক খেয়াল করে বানান তিনটে বলুন দেখি!’

—‘বেশ, বল।’

—‘প্রথম বানান মুমূর্ষু।’

—‘ম-য়ে হ্রস্বউ, ম-য়ে দীর্ঘউ আর মূর্ধ্যাষ-এ রেফ হ্রস্বউ।’

হেবো বললে, ‘ঠিক। এবার বলুন—মুহূর্ত।’

—‘ম-য়ে হ্রস্বউ, হ-য়ে দীর্ঘউ আর ত-য়ে রেফ।’

হেবো বললে—‘ভুল।’

প্রবীরচন্দ্র বলেন, ‘না হে ভুল নয়। এখনকার বানান তয়ে রেফ। আগে ছিল তয়ে তয়ে রেফ।’
হেবো আবার বললে—‘ভুল।’

প্রবীরচন্দ্র চটে উঠে বলেন, ‘তবে তুমি ঠিক বানানটা বল শুনি!’

হেবো বললে, ‘ভ-য়ে হুশউ আর ল।’

থমকে গিয়ে প্রবীরচন্দ্র বলেন, ‘তার মানে?’

—‘তার মানে, প্রথম দুটি বানান আপনার ঠিকই হয়েছে। তৃতীয় বানান যেটার আমি জানতে চেয়েছি সেটা হচ্ছে—“ভুল”; আপনি বলতে পারছিলেন না।’

হোহো করে হেসে ওঠে সবাই।

প্রবীরচন্দ্র বলেন, ‘স্বীকার করছি, ঠকে গেছি।’

হেবো বললে, ‘গুরুদেবও ঠিক ঐভাবেই স্বীকার করেছেন যে, তিনি ঠকে গিয়েছেন। গুরুদেব ভেবেছিলেন উইলটা চুরি করতেই আমি সর্বশক্তি নিয়োগ করব। তাই টোপ ফেলে চার ছড়িয়ে বঁড়শি ছিপ হাতে বসেছিলেন উনি। আসল উইলটা সঙ্গে নিয়ে একটা নকল উইল সিন্দুকে রেখে এবং চাবিটা ফেলে চলে গেলেন। গুরুদেব ভেবেছিলেন নকল উইলটা চুরি করে বোকা হব আমি। কিন্তু উনি যান ডালে ডালে তো আমি যাই পাতায় পাতায়। সব জেনেশুনেও সেই নকল উইল চুরি করলাম আমি। বোকা সাজলাম।’

বাধা দিয়ে প্রবীরচন্দ্র বলেন, ‘সে তো বুঝলাম। কিন্তু আসল উইলটা কোথায় গেল?’

—‘কেন, যেখানা গুরুদেব পরে বার করলেন।’

—‘সেটা তো সাদা কাগজ!’

হেবো হেসে বললে, ‘সেখানাই আসল উইল। আমি কলকাতা গিয়ে কাকিমার কাছ থেকে টাকা নিয়ে কিছু মাল-মশলা কিনি। একটা কালো পাইলট কলম, কিছু স্টার্চ আর আইওডিন। স্টার্চের সল্যুশনে কয়েক ফোঁটা আইওডিন ফেলে দিয়ে ব্লু-ব্ল্যাক রঙের কালি হয়। কিন্তু সেটা ম্যাজিক কালি; কিছু পরেই লেখা উপে যায়। কাগজে কোনো দাগ থাকে না। উইল করার আগের দিন যখন ক্যাবল গেল ডাক্তারবাবুর ব্যাগ আনতে তখন ঐ কালি-ভর্তি কলমটা আমি কলমদানিতে রেখে দিই। আগের রাতেই বাড়ির অন্যান্য ফাউন্টেন পেন চুরি গিয়েছে। ফলে আশা করছিলাম ঐ কলমেই উইল লেখা হবে। একমাত্র ভয় ছিল—অ্যাডভোকেট-সাহেব যদি শেষ মুহূর্তে তাঁর পকেট থেকে কলম বার করে বসেন। কিন্তু আমি ভগবানে বিশ্বাস করি। সম্পত্তির কণামাত্র না পেয়েও যখন কাকিমা তাঁর শ্বশুরের সেবা করতে গেলেন তখন ডাক্তারবাবু রাগ করে বলেছিলেন—তোমার কথায় ভগবানে বিশ্বাস হারিয়ে ফেলেছি মা! আর ঠিক তখনই আমার মনে হয়েছিল—ভগবান আমার কথা নিশ্চয়ই শুনেছেন। সবাই ঐ কলমেই সই দিয়েছেন।’

কাকা বলেন, ‘কিন্তু ডাক্তারবাবুও কি তাঁর নিজের কলমে সই করেননি?’

নকুলবাবু বলেন, ‘না, নিয়ম হচ্ছে দলিলে সকলে একই কলমে সই করবে—যাতে প্রমাণ হয় সাক্ষীর দলিলকারীর সঙ্গে একই সময়ে সই করেছেন। এ নিয়ম খুব কঠোরভাবে মানা হয় না; কিন্তু সুধাকান্তবাবু পাকা উকিল; আইনের খুঁত তিনি রাখবেন না। তাই আমি আর ডাক্তারবাবু যখন দ্বিতীয়বার সই দিতে ফিরে গেলাম তখন তিনি তাঁর কলমটা এগিয়ে দিয়েছিলেন।’

মঞ্জুলা দেবী বলেন, ‘হেবো, তাই বুঝি তুমি ডাক্তারবাবুকে সই করতে পীড়াপীড়ি করছিলে?’

হেবো হেসে বলে, ‘ঐ মুহূর্তটাই ছিল আমার কাছে সবচেয়ে উত্তেজনাপূর্ণ। ডাক্তারবাবু যদি সই না দিতেন, তাহলে ঐরা দ্বিতীয় ডাক্তারকে ডাকতে যেতেন—ফলে উইল তখনই সীলমোহর করা হতো না। আর ঘন্টাকয়েক পর দ্বিতীয় ডাক্তারবাবু যখন সই দিতে আসতেন ততক্ষণে লেখা সব আবছা হয়ে যেত। ধরা পড়ে যেতাম আমি।’

প্রবীরচন্দ্র ওকে জড়িয়ে ধরে বলেন, ‘সাবাস হেবো! বাঙলা সিনেমার তুমি ক্ষুদ্রে নায়ক হতে পার!’

শ্রদ্ধের নিমন্ত্রণ রাখতে এসেছিল হেবো। মঞ্জুলা দেবী ওকে কাছে ডেকে বলেন, ‘শ্রদ্ধের পর পণ্ডিতবিদায় করতে হয়। তুমি একটি ক্ষুদ্রে পণ্ডিত! ঐহী তোমার পণ্ডিতবিদায়।’

ছোট্ট একটা বাইনোকুলার। অত্যন্ত জোরাল তার লেন্স। বহু দূরের জিনিস স্পষ্ট দেখা যায়। হেবো জানলার কাছে সরে এসে দেখল, রাস্তার ওপারে যে ভদ্রলোক চায়ের দোকানে বসে খবরের কাগজ পড়ছেন, তার হরফগুলো পর্যন্ত পড়া যাচ্ছে।

জয়দ্রথ-বধ পালা ব্যাৎসর্গে শেষ হওয়া হেবো আগেই আল্লাদে আটখানা হয়েছিল, বাইনোকুলারটা হাতে পেয়ে সে যেন ষোলোখানা হয়ে গেল।

আদি পর্ব

কলকাতায় ফিরে এসে হেবো দেখে যথারীতি তার নামে একখানা সীলবন্ধ চিঠি এসেছে। খামটা না খুলেই বুঝতে পারে এটা কার লেখা। আশ্চর্য ভদ্রলোকের ধৈর্য! প্রতিবার হেবো সাফল্যমণ্ডিত হয়, আর উনি ফোড়ন কাটেন। অসহ্য!

ও! তোমরা বুঝি বুঝতে পারছ না? না, দোষ তোমাদের নয়, আমারই। রাম-জন্মের আগেই রামায়ণের কাহিনী ফেঁদে ফেলেছি আমি। ‘গুরুবিদায় পর্বটা’ হেবোর জীবনে এসেছে অনেক পরে। ডাক্তার ওয়াটসনের মতো তোমরা যদি কেউ ওর কীর্তিকাহিনী ভবিষ্যতে কখনও লিখতে চাও তবে আমার মতো উন্টোপাণ্টা করে লিখো না। আগের কথা আগেই লিখো। চিঠিখানা কোথা থেকে এসেছে, এবং খাম না খুলেই হেবো কেমন করে তার অন্তর্নিহিত জ্বালা অনুভব করল, তাহলে এবার সেই গোড়ার কথাগুলো বলতে হয় : কেমন করে হেবো গোয়েন্দা হয়ে উঠল।

হেবোর বর্তমান বয়স ষোল। এবার স্কুল ফাইনাল পরীক্ষা দেবে সে। কিন্তু গোয়েন্দাগিরির ভূত তার ঘাড়ের চেপেছে যখন সে ক্লাস সিঙ্গে-সেভেনে পড়ে। এই তিন-চার বছরের ভেতরেই সে একের পর এক কয়েকটি মারাত্মক রহস্যের কিনারা করে ফেলেছে। আমার তো ধারণা বড় হলে ওর নাম ও-দেশের শার্লক হোমস, ইয়ারকুল প্যেরো, আর এ-দেশের ব্যামকেশ বক্সী, পরাশর বর্মা, জয়ন্ত অথবা পি. কে. বাসুর সঙ্গে একই সঙ্গে উচ্চারিত হবে—মানে তোমরা যদি কেউ ওয়াটসনের ভূমিকা নিতে রাজি হও। তাই তোমাদের সুবিধা হবে মনে করে ওর গোয়েন্দা-জীবনের আদি কথাটা এবার বলে রাখি।

আগেই বলেছি, গোয়েন্দাগিরির যাবতীয় সরঞ্জাম সে ছেলেবেলা থেকেই সংগ্রহ করে রেখেছিল তার বাস্কে। মেজদির সেলাইয়ের বাস্কে থেকে একটা মাপবার ফিতে, দাদুর বাতিল-করা চশমার একটা পুরা লেন্স, একটা মোটা নোটবই। নোটবইতে সময়ে-অসময়ে সে নানান তথ্য টুকে রাখত। কোন সমস্যার ক্লু কোন সূত্রে প্রয়োজন হবে তা কে জানে? ঐ নোটবইটা নিয়ে মেজদা ওকে কত ঠাট্টাই না করেছে! সবার সামনে ঠাট্টা করে বলত হেবোর নোটবইতে সব খবরই লেখা আছে, শুধু লেখা নেই—‘পাগলা যাঁড়ে করলে তাড়া কেমন করে ঠেকাব তায়।’

হেবো রাগ করত না। সে জানত তার দিনও একদিন আসবে। এলও তাই, একেবারে অপ্রত্যাশিতভাবে।

হেবোর মেজদির বিয়ে হয়েছিল মাসকতক আগে। হেবো তখন ক্লাস সিঙ্গে পড়ে। পূজোর সময় মেজদির শ্বশুরবাড়ি তত্ত্ব পাঠানো হবে। বাবা আর কাকা বাজার উজাড় করে পূজোর তত্ত্ব সওদা করে আনলেন। গোল বাধল জুতোজোড়া নিয়ে। জামাকাপড়গুলো গুছিয়ে রাখতে রাখতে হেবোর মা বলেন—‘জুতোজোড়া মনে হচ্ছে খুকির পায়ে বড় হবে।’

মেজদা সেটা নেড়েচেড়ে পরীক্ষা করে বলে—‘বড় নয় মা, ছোটই হবে—এই দেখ আমার পায়ের ছোট হচ্ছে।’

কাকা বলেন—‘আমারও তাই মনে হয়েছিল। দাদাকে বললাম আর এক সাইজ বড় নাও বরং, তা দাদা—’

বাধা দিয়ে হেবোর বাবা বলে ওঠেন—‘আরে না, ওর চেয়ে বড় হলে খুকি উন্টে পড়ে যাবে।’

ক্রমে দেখা গেল আন্দাজে-কেনা জুতোর মাপ সম্বন্ধে বাড়ির প্রত্যেকের মতামত বিভিন্ন প্রকারের। বাড়ির সবাই যেন বিধানসভায় ভোট দিচ্ছেন—একদল সরকারী পক্ষ, একদল বিরোধী পক্ষ। মেজদা

হেসে বলে—‘শ্রীমান শার্লক হেবো এ বিষয়ে কী বলেন? তিনি তাঁর কাস্টিং ভোটটা এবার দিলেই পারেন!’

এই সুযোগ! হেবো কোনো কথা বলল না, সোজা উঠে গেল নিজের পড়ার ঘরে। ফিরে এল একটু পরেই। হাতে তার নোটবুক। বিধানসভার স্পীকারের মতোই গম্ভীর স্বরে বললে—‘আন্দাজে কথা বলা শার্লক হেবোর ধাতে নেই। আমার প্রত্যেকটি সিদ্ধান্ত প্রমাণের ওপর প্রতিষ্ঠিত। জুতো মেজদির পায়ে ঠিক হবে।’

নোটবইটা সে মেলে ধরে সকলের সামনে। মেজদির বিয়ের সময় যে জুতোজোড়া কেনা হয়েছিল—তার নম্বর টুকে রাখা আছে ওর নোটবইতে দু-মাস আগে। কাকা বলেন—‘ভাগ্যিস হেবোর নোটবইটা ছিল!’

হেবো গর্বের হাসি হাসল শুধু।

*

*

*

ক্লাসের ছেলেরা, পাড়ার বন্ধুরা, মায় বাড়ির সবাই মেনে নিয়েছে হেবো একটা হবু-গোয়েন্দা। বাঙলার ভবিষ্যৎ শার্লক হোমস। একমাত্র মেজদাই সেটা মেনে নিতে রাজি নয়। হেবোর চেয়ে সে দু-বছরের বড়—সেবার তার পরীক্ষার বছর। হিউম্যানিটিস গ্রুপে হায়ার সেকেন্ডারি। হেবোকে সে মনে করে নেহাত নাবালক। হেবোর গোয়েন্দাগিরির ওপর কখনও তার অহৈতুকী উদ্ভা, কখনও বা দাদা-সুলভ তাত্ত্বিকতা। বাবা-কাকার সুরে সুর মিলিয়ে হেবোকে কখনও উপদেশ দেয়—‘এসব ছেলেমানুষী ছেড়ে দে হেবো, নইলে বেঁধোরে ফেন্সু মারবি।’ কখনও বা লুকিয়ে গিয়ে মায়ের কাছে চুকলি কাটে—‘মা, হেবো আবার ডিটেকটিভ বই পড়ছিল!’ ঠাট্টা করে মেজদাই ওর এই নামকরণটা করেছে—শার্লক হেবো। হেবোর অবশ্য তাতে দৃষ্টি নেই। সে জানে ঐ বিদ্রূপের নামই সে একদিন সার্থক করে তুলবে। ঐ নামই হবে তার গৌরবের পরিচয়। তাছাড়া মেজদা যে কেন এতটা চটেছে তাও তো আর অজানা নেই ওর। সে একটা ভারি মজার গল্প।

পৌষ-সংক্রান্তির আগের দিন। মা, কাকিমা আর মেজদি মিলে সারাটা দুপুর ধরে নানান রকম পিঠে তৈরি করেছে। হেবোর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি এড়িয়ে কিছুই হবার উপায় নেই। বিশেষ করে খাদ্যসামগ্রী। হেবো জানে, চার রকমের মিষ্টি হয়েছে—গোকুল পিঠে, রসবড়া, পুলি-পিঠে আর সরুচুকলি। সংখ্যায় কোন জাতের মিষ্টি কটি তৈরি হয়েছে তারও মোটামুটি হিসেব লেখা আছে ওর নোটবইতে। স্বীকার করতে লজ্জা নেই—লোভ তার কিঞ্চিৎ হয়েছিল। কিন্তু তাই বলে তো হ্যাংলার মতো চাইতে পারে না! হেবো তাই অন্য একটি যুক্তির অবতারণা করে বলেছিল—‘আরে মেজদি, একটার পর একটা বানিয়ে তো যাচ্ছ—একটু টেস্ট করে দেখা তো উচিত—মানে, ঠিকমতো ভেতরে রস ঢুকছে কিনা—’

কাকিমা এ যুক্তিতে হেসে ফেলেছিলেন। তবু হয়ত দুটো রসবড়া ওকে পরখ করতে তুলে দিতেন; কিন্তু মা-মেজদির ভোটাদ্বিধা ওর প্রস্তাবটা পাস হল না। মা বললেন—‘সে আর তোকে নতুন করে দেখতে হবে না। এইমাত্র তোর মেজদা পরখ করে বলে গেল।’

যুক্তির বাইরে যেতে পারে না হেবো। অগত্যা ওকে ঢোক গিলে যেতে হয়। রাত্রে বিছানায় শুয়ে বার-বার ঐ পিঠেগুলোর কথাই ওর মনে হয়েছে, ঘুম আসার আগে পর্যন্ত। ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে সে স্বপ্নও দেখল, পুলি-পিঠেগুলোর গায়ে লেপ্তি জড়িয়ে মেজদা গচ্চা-গচ্চি খেলছে। হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল হেবোর। রাত তখন নিশুতি। সমস্ত বাড়িটা ঘুমোচ্ছে। কোথাও কোনো সাড়াশব্দ নেই, মাঝের হল-কামরার বড় ঘড়িটার টুক-টুক ছাড়া। হেবোর হঠাৎ মনে হল ভাঁড়ার ঘর থেকে যেন একটা সন্দেহজনক শব্দ আসছে, বাসনপত্র সরানোর শব্দ। কিছুদিন আগেই পাড়ায় মিঠুয়াদের বাড়ি চুরি হয়ে গিয়েছে। সে-চুরির কিনারা হয়নি। পুলিশে খামোখা মিঠুয়াদের নতুন চাকরটাকে ধরে নিয়ে গিয়েছে। একেই চুরিতে বিপদগ্রস্ত, তার ওপর চাকরটাও বেহাত হওয়ায় মিঠুয়ার মায়ের অবস্থা চরমে উঠেছে। হেবো সবই খবর রাখে। বাসনপত্র সরানোর আওয়াজ শুনেই হেবো বুঝতে পারে ব্যাপারখানা। এ নিশ্চয়ই সেই সিঁদেল চোরের কাণ্ড।

জন্ম-ডিটেকটিভ শার্লক হেবো। তড়াক করে খাট থেকে নেমে পড়ে সে। খাটের নিচে থেকে টেনে নেয় হকিস্টিকটা। ধরতেই হবে বাছাধনকে এবার! পা টিপে-টিপে সাহসে ভর করে একাই এগিয়ে গেল সে ভাঁড়ারঘরের দিকে। প্যাসেজের আলোটা সে ইচ্ছা করেই জ্বালে না। চোর যেন টের না পায়। পাগলা দাশুদের স্কুলে কে যেন একবার চোর ধরতে গিয়ে বেড়াল ধরে নাকাল হয়েছিল। হেবো সে ভুল করবে না। অতি সন্তুর্ণণে সে উঁকি দিয়ে দেখল ভাঁড়ার-ঘরের আধ-ভেজানো দরজার ফাঁক দিয়ে। ঘর নীরব্র্ত্ত অন্ধকার—তবু মনে হল একটা মানুষ মোড়ার ওপর দাঁড়িয়ে ওপরের তাক থেকে কিছু পেড়ে নামাচ্ছে। কী আবার? বাসনপত্র নিশ্চয়ই! হেবো সাবধানী—সে জানে চেষ্টায়ে উঠলে অথবা আলো জ্বাললে চোর তাকে ধাক্কা মেরে ছুটে পালিয়ে যাবে! তার হাতে হকিস্টিক আছে বটে, কিন্তু চোরের হাতে যে ছোরা অথবা রিভলভার নেই, তারই বা নিশ্চয়তা কি? ছেলেমানুষকে কাবু করে পালিয়ে যাওয়া একটা জোয়ান মানুষের পক্ষে কিছু না।

কিন্তু বয়সে ছোট হলে কী হবে? মদোন্মত্তের চেয়ে শশকও বয়সে বড় ছিল এমন প্রমাণ নেই। হেবো জানে ভাঁড়ারঘরে এই একটিমাত্র দরজা। ও-পাশের জানলায় গরাদ দেওয়া আছে। আর মুহূর্ত্তমাত্র দেরি করে না হেবো; চট করে ভাঁড়ারঘরের দরজায় শিকলটা তুলে দেয়। ব্যাস, বাছাধন এবার ইঁদুর-জাঁতাকলে বন্দী! এখন রিভলভারই হোক আর ছোরাই হোক, হেবোর হাতে ওর নিষ্কৃতি নেই। পরমুহূর্ত্তেই হেবোর গগনবিদারী চিংকারে বাড়ির নৈশ নিস্তব্বতা খানখান হয়ে যায়—‘চোর! চোর!! চোর!!!’

ছুটে এল বাড়িসুদ্ধ সবাই। বাবা-মা-কাকা-কাকিমা, মায় ছট্টলাল আর বামুনদি। লাঠিটা বাগিয়ে ধরে ছট্টলাল এসে মহড়া নিল দরজার সামনে। সারা বাড়ির আলো তখন জ্বলে উঠেছে। ছট্টলাল দরজার শিকলে হাত দিয়ে তার দেহাতি ভাষায় চিংকার করে বললে পালাবার চেষ্টা করলে কিন্তু মাথা ফাটিয়ে দিতে পিছপা হবে না সে!

কাকা বলেন—‘দরকার কী ছট্টলাল! দরজা বন্ধই থাক! আগে পুলিশে খবর পাঠানো যাক।’

ছট্টলাল তার গৌফের প্রান্তে চাড়া দিয়ে বললে, এমন কলে-পড়া ইঁদুর যদি তার হাত ফসকে পালায় তবে চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে বাজুবন্ধ পরে সে ফিরে যাবে ছাপরা জেলায়!— ‘আপ দেখিয়ে না হজুর, কেয়া হাল করের! সালা চোট্টাকো হাম ছাতু বনা দুঙ্গা!’

শিকল খুলে দিয়ে, লাঠিটা বাগিয়ে ধরে দড়াম করে দরজটা সে খুলে দেয়।

বের হয়ে এলেন রসবড়া-রসাপ্রুত মেজদা!

সে অপমান মেজদা ভুলতে পারেনি। তোমরাই বল, সে লজ্জার কথা কি তোলা যায়! একবাড়ি লোকের সামনে রাত দুটোর সময় চোর বলে ধরা পড়াই শুধু নয়, সেই পৌষ মাসের শীতে মধ্যরাত্রিতে বেচারিকে ঠাণ্ডা জলে স্নান করতে হয়েছিল। তাড়াহুড়োয় রসবড়ার মাটির হাঁড়িটা উন্টে পড়েছিল ওর মাথায়! ভাঙা হাঁড়ির কানাটা আটকে ছিল গলায়, জয়মাল্যের মতো।

তাই মেজদার যত আক্ৰোশ হেবোর ওপর। ক্ষেপ করে না হেবো। চোর সে ঠিকই ধরেছিল। বাইরের চোর না হোক, ঘরের চোর,—বাসন-চোর না হোক, রসবড়া-চোর।

*

*

*

কিন্তু যে ঘটনার পর থেকে হেবো গোয়েন্দা হিসাবে সকলের কাছে প্রথম স্বীকৃতি পেল, যে ঘটনায় তার নাম প্রথম ছাপা হল খবরের কাগজে, এবার সেই ঘটনার কথাই বলব তোমাদের।

সেবার পূজোর ছুটিতে হেবোর বাবা কলকাতার বাইরে বেড়াতে যাবার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। ক’দিন ধরে বাড়িতে নানান জল্পনা-কল্পনা। মধুপুর—পুরী—না দার্জিলিং? শেষমেশ স্থির হল, না ওসব কিছু নয়, যাওয়া হবে বাবা বিশ্বনাথের চরণ দর্শন করতে। বেনারস। হেবোর ফুর্তি দেখে কে! বহুদিন বাঙলার বাইরে যায়নি ওরা। রেলগাড়ি খোলা প্রান্তরের মধ্যে দিয়ে হু-হু করে ছুটেছে—আর জানলায় মাথা রেখে বসে আছে হেবো, এটা ভাবলেই একটা শিহরন লাগে। ঠিক হল বাবা-মা-মেজদা আর হেবো যাবে কাশীতে। কাকা যাবেন কাকিমাকে নিয়ে কাকিমার বাপের বাড়ি মালদায়। ছট্টলাল থাকবে

বাড়ির তদারকে। হেবো তাকে নানারকমভাবে তালিম দিয়ে শিখিয়ে দিল খালি বাড়ি কেমনভাবে পাহারা দিতে হবে।

তারপর স্কুলের ছুটি হলে নির্দিষ্ট দিনে ওদের স্টেশনে তুলে দিতে এলেন কাকা-কাকিমা। আলোয়-আলো হাওড়া স্টেশন। দেরাদুন এক্সপ্রেসটা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গজরাচ্ছে। অসম্ভব ভিড় হয়েছে। পুজোর সময় যেমন হয় আর কি। ওদের কামরায় অবশ্য ভিড় হয়নি মোটেই। রিজার্ভ কামরা। অর্থাৎ কামরাটায় যতগুলো সীট আছে ঠিক ততগুলো রিজার্ভেশন টিকিট বিক্রি করা হয়েছে। হেবো লক্ষ্য করে দেখে রেলের কামরায় লেখা আছে—‘বারো জন বসিবেক’। গুণে দেখল বারো জন লোকই আছে বটে। কিন্তু তারপই লক্ষ্য হল রেল-কোম্পানির আর একটি বিজ্ঞাপ্তি :

‘চোর জুয়াচোর পকেটমার নিকটেই আছে।’

আপন মনেই হাসল হেবো। কী বুদ্ধি রেল-কোম্পানির বড়কর্তাদের! আরে বাপু, চোর-জুয়াচোর যে নিকটেই আছে এ সাধারণ সংবাদটা কি শার্লক হেবো জানে না? কিন্তু ঐভাবে প্রকাশ্য বিজ্ঞাপ্তি দিয়ে চোর-জুয়াচোর-পকেটমারদের সাবধান করে দেবার মানেরটা কী? যাই হোক, সাবধান সে প্রথম থেকেই হয়ে আছে। স্বভাবসুলভ তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দিয়ে সব যাত্রীদের সে লক্ষ্য করতে থাকে। সকলেই কিছু চোর-জুয়াচোর নয়; কিন্তু বিজ্ঞাপ্তি যখন দেওয়া হয়েছে তখন নিশ্চই চোর-জুয়াচোর লুকিয়ে আছে ওদের মধ্যে।

কে হতে পারে? অধিকাংশই পশ্চিমা লোক। ওদের পরিবার ছাড়া আরও একটি বাঙালি পরিবার বসেছেন সেই কামরায়। কর্তা-গিন্নী, আর দুটি ছেলেমেয়ে। ও পাশের দূরের ঐ সাধুবাবার ওপর কেমন যেন সন্দেহ হয়। ওর দাড়িটা নকল নয় তো? সাধু-সন্ন্যাসী মানুষ কি আগে থেকে সীট রিজার্ভ করিয়ে রাখে? ও কোন জাতের সাধু তাহলে? তাছাড়া মাঝের বেষ্টিতে এ মধ্যবয়স্ক পাঞ্জাবী লোকটি? তিনিই বা এত রাতে গগলস চোখে দিয়ে আছেন কেন? এঁরও দাড়ি আছে, তার ওপর পাগড়ি।

হেবোরা বসেছিল দরজার উল্টোদিকে একটা কোণ ঘেঁষে। সেখান থেকে সকলের ওপরেই বেশ নজর রাখা চলে। বর্ধমানে গাড়ি দাঁড়াল। এ পাশের মারোয়াড়ি ভদ্রলোক সীতাভোগ কিনলেন। আসানসোলে মধ্যরাত্রে উঠল অনেক লোক। শিখ ভদ্রলোক ‘রিজার্ভ গাড়ি’ বলে দরজা আড়াল করে দাঁড়ালেন; তবু কিছু লোক জোর করে উঠল। ‘বারো জন বসিবেক’ আইন আর মানা যাচ্ছে না। একজন পশ্চিমা মুসলমান ভদ্রলোক উঠলেন। গায়ে ঘুন্টি-দেওয়া মেরজাই—মাথায় কাজ করা সাদা টুপি। মেজদা বসেছিল বেষ্টির প্রান্তে। তাকে ঠেলেঠেলে পশ্চিমা ভদ্রলোক বসবার উপক্রম করতেই মেজদা তার বাজখাঁই গলায় চুঁচিয়ে ওঠে—‘একদম জায়গা নেই দেখতে পার্তা নেই? মানুষকা মুণ্ডুর ওপর বসেগা না কি রে বাপু?’

ভদ্রলোক সবিনয়ে বলেন—‘জরা মদৎ তো করো ভাইসাব, ওঁর এক মুসাফিরকে লিয়ে কাফি জগাহ হো সন্তা।’

এই সময় শিখ ভদ্রলোক চট করে সুটকেসটা নিয়ে নেমে গেলেন। ফলে হেবোর মেজদাকে আর মদৎ করতে হল না—পশ্চিমা ভদ্রলোক মাঝের বেষ্টিতে ঐ খালি আসনটি দখল করলেন। আরও যারা উঠেছিল এই স্টেশনে তাদের দাঁড়িয়েই থাকতে হল। ‘বসিবেক’-এর হিসাবটাই রেল কোম্পানি করেছে; মাঝপথে ভিড় ঠেলে উঠলে কতজন ‘দাঁড়াইবেক’ এবং কতজন পাদানি থেকে ‘খুলিবেক’ তার তো আর কোনোও হিসাব নেই। শুধু একজন ফতুয়া-পরা ভুঁড়ি-সর্বস্ব ভোজপুরী পশ্চিমা লোক এই এত লোকের ভিড় ঠেলে কায়দা করে উঠে গেল বাস্কের ওপর। গাড়ি আসানসোল ছাড়ল।

আবার বসে বসে সবাই চুলতে শুরু করেছে। কেউ-কেউ বই পড়ছে সেই আধো অন্ধকারে। মাঝের বেষ্টির মুসলমান ভদ্রলোকটি টেনে নিলেন হেবোর বাবার ‘আনন্দবাজার’ খানা। জেগে থাকলে হয়ত হেবোর বাবা অবিনাশবাবুর অনুমতি নিতেন তিনি, কিন্তু হেবো দেখল ওর বাবা বসে বসেই ঘুমোচ্ছেন। হেবোর ঘুম আসছিল না। তা ছাড়া আজ রাতে সে ঘুমাবে না—ঘুমোনা উচিতও নয়! এই সুযোগে পকেট থেকে হেবো অতি সত্তর্পণে বার করে একখানা চটি বই, ‘হত্যাকারী কে?’ পড়তে থাকে একমনে। বই পড়ছে বটে, কিন্তু সজাগ দৃষ্টি তার ঠিকই আছে সকলের ওপর। শোবার জায়গা বস্তুত কেউই পায়নি, একমাত্র বাস্কের ওপরের ঐ ভুঁড়িয়াল ভোজপুরীটা ছাড়া। অন্য সকলেই বসে

বসে চলেছে। নাক ডাকার শব্দ আসছে বাস্কের ওপর থেকে। অতবড় দেহটাকে কায়দা করে লোকটা ঘুমোচ্ছে কেমন করে? বার-বারই হেবোর নজর যাচ্ছে ঐ বিস্তৃতিটার দিকে—‘নিজে টিকিট কেন, মালের ওপর নজর রাখ,—চোর জুয়াচোর পকেটমার নিকটেই আছে।’

জেগেই রাতটা কাটিয়ে দেবে স্থির করেছিল, কিন্তু ওরই মধ্যে কখন একটু ঢুলুনি এসেছে। হঠাৎ একটা বিকট শব্দে চমকে জেগে ওঠে হেবো। গাড়ি তখন একটা টানেলের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে। টানেলের গুমরানির বিকট শব্দেই ঘুম ভেঙে গিয়েছে ওর। নাঃ, ভয়ের কিছু নেই। তাদের মালপত্র সব ঠিকই আছে। ঘুমোচ্ছে সবাই, বসে বসেই। শুধু বাঙালি ভদ্রলোকটি জেগে বই পড়ছেন। আর আসানসোল থেকে ওঠা সেই ভদ্রলোকটি, যিনি মেজদাকে সরে বসতে বলেছিলেন, তিনিও জেগে আছেন—খবরের কাগজটা তখনও দেখছেন। সাধুবাবাও অবশ্য জেগে আছেন, গঞ্জিকা-সেবনে ব্যস্ত তিনি। এবার নিশ্চিত হয়ে ঘুমোলো হেবো।

*

*

*

ঘুম ভাঙল একটা চৌচামেচিতে। গাড়ি তখন দাঁড়িয়ে আছে গয়া স্টেশনে। ভোর হয়-হয় আর কি। অবাক চোখে হেবো দেখে, কামরাতে উঠেছে দু-জন যুনিফর্মধারী পুলিশ। আরও দু-জন পুলিশ অফিসার উঠেছেন কামরায়। ঐ দিককার বেঞ্চিতে যে বাঙালি ভদ্রলোক সপরিবারে যাচ্ছিলেন তাঁর সঙ্গে একজন পুলিশ অফিসারের কথা-কাটাকাটি হচ্ছে।

ভদ্রলোক বলছেন—‘কেন মশাই, বাঙালি হয়ে জন্মেছি বলেই কি চোরের দায়ে ধরা পড়েছি?’

পুলিশ অফিসারটি বলছেন—‘আহা, আপনি রাগ করছেন কেন? আমি তো শুধু আপনার নামটাই জিজ্ঞাসা করেছি। আমাদের খবর—লোকটা বাঙালি, তাই জিজ্ঞাসা করছি। কই অবিনাশবাবু তো রাগ করেননি?’

হেবো বুঝতে পারে এর আগে তার বাবাকেও জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছে। কিন্তু ব্যাপারটা কী? একটু চেষ্টা করেই বুঝতে পারে ব্যাপারটা। এরা আবগারি পুলিশ—মানে মদ-গাঁজা-আফিং নিয়ে যারা চোরাকারবার করে তাদের ধরে বেড়ায়। ওরা নাকি খবর পেয়েছে, এই গাড়িতে একজন অনেকদিনের পাকা চোরাকারবারী এক সুটকেস আফিং নিয়ে পালাচ্ছে। লোকটা বাঙালি—সুটকেস তার সঙ্গেই আছে।

দ্বিতীয় অফিসার প্রথম জনকে বললেন—‘এঁদের আর মিথ্যে হয়রানি করে কী হবে মুখুজ্জে? এঁরা সব ভদ্রলোক; আমার মনে হয় আসানসোলে যে পাঞ্জাবী লোকটা সুটকেস হাতে এই কামরা থেকে নেমে গেল,—সেই যে গগলস-পরা লোকটা হে—সেই আসল ঘাঘি! রাত্রিবেলা গগলস দেখেই আমার সন্দেহ হয়েছিল, বেটা শিখ সেজে চোখে ধুলো দিয়ে গেল।’

মুখার্জিসাহেব বললেন—‘আমারও তাই মনে হয়।’

—‘তাহলে আর সময় নষ্ট করে কী হবে, চল যাই।’

—‘চলো।’

দু-জন অফিসারই গাড়ি থেকে নেমে এলেন প্ল্যাটফর্মে। হেবো কামরার সকলের ওপর একনজর চোখ বুলিয়ে নিল। গণ্ডগোলে সবাই জেগে উঠেছে—একমাত্র বাস্কের ওপর শায়িত বিশালবপু ভোজপুরী প্রভুর নিদ্রাভঙ্গ হয়নি এত গণ্ডগোলেও। একটানা নাক ডেকে চলেছেন তিনি। মেজদা হেবোকে কনুই-এর একটা গুঁতো মেরে বললে—‘শার্লক হেবো, একটু এনকোয়ারি করে দেখলে পারতে!’

হেবো জবাব দেয় না। সে তখন গভীর চিন্তায় ডুবে গিয়েছে। একমনে কীসের যেন হিসাব করে যাচ্ছে চোখ বুজে। তারপর, কোথাও কিছু নেই, এক লাফ দিয়ে সে নেমে পড়ে প্ল্যাটফর্মে। হাঁ-হাঁ করে ওঠে গাড়ি-সুদ্র লোকজন। আবগারি অফিসার দু-জন ছুটে এসে ওকে ধরে তোলেন। বলেন—‘পড়ে গেলে কেমন করে, খোকা?’

—‘খোকা নয়,’ প্রতিবাদ করে হেবো,—‘আমার নাম হেবো, শার্লক হেবো। আর, পড়ে আমি যাইনি, ঝাঁপ দিয়েছি মাত্র। বিপদে ঝাঁপ দেওয়াই আমার স্বভাব।’ সে যাক। আপনারা ভুল করেছেন, আফিং-চোর এই কামরাতেই আছে। আসুন, আমি দেখিয়ে দিচ্ছি।’

হেবোর বাবা অবিনাশবাবুও নেমে এসেছেন ততক্ষণে। পুলিশ অফিসার ভদ্রলোক হেবোকে তার বাবার জিন্সায় পৌছে দিয়ে বলেন—‘আপনার ছেলে? নিন! তবে এ তুখোড় ছেলেটিকে একটু সামলিয়ে রাখবেন!’

হেবো চিংকার করে ওঠে—‘আমার কথা বিশ্বাস করছেন না আপনারা? আমি আন্দাজে কিছু বলছি না। প্রমাণ আমার হাতে।’

প্রচণ্ড ধমক দিয়ে ওঠেন অবিনাশবাবু—‘কী পাগলামি করছিস হেবো?’

কিন্তু দ্বিতীয় অফিসারটি হঠাৎ বলে বসেন—‘বেশ তো, দেখাই যাক না ও কী বলতে চায়। কী বলছ খোকা? আফিং-চোরকে তুমি দেখিয়ে দিতে পারবে?’

হেবো কোনো কথা বলে না। গটগট করে কামরায় ফিরে এসে বলে—‘আফিং নিয়ে পালাচ্ছেন এই ভদ্রলোক।’

অস্বাভাবিক সে দেখিয়ে দিল মাঝের বেশিতে বসা সেই মুসলমান ভদ্রলোকটিকে। আসানসোলে উঠে যিনি মেজদাকে সরে বসতে বলছিলেন। তাজ্জব কাণ্ড! হেবোর বাবা আর সামলাতে পারেন না নিজেকে। প্রচণ্ড রাগে হেবোর কানটা ধরে একটা থাপ্পড় কসিয়ে দিলেন ওর গালে। বাধা দিলেন সেই আবগারি অফিসারটি। বলেন—‘আহা, গাড়ির মধ্যে আর মারধোর করবেন না। বাড়ি গিয়ে শাসন করবেন বরং।’

মুসলমান ভদ্রলোকটি বোধহয় এদের কথাবার্তা কিছুই বুঝতে পারেননি। ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকেন তিনি। হেবোর গালটা জ্বালা করছে। কানটাও লাল হয়ে উঠেছে। কোনোরকমে চোখের জল সামলে সে শুধু বললে—‘প্লীজ, ওঁর সুটকেসটা খুলে দেখুন আপনারা শুধু!’

মুসলমান ভদ্রলোক বলেন—‘হ্যাঁ ক্যা?’

আবগারি দারোগা চলেই যাচ্ছিলেন, হঠাৎ কী ভেবে ফিরে আসেন তিনি। সুটকেসটার দিকে হাত বাড়াতেই ঘটে গেল তাজ্জব কাণ্ড। পট করে বেশির ওপর উঠে দাঁড়াল সেই মুসলমান লোকটা। চট করে পকেট থেকে বার করে সে কালো রঙের একটা ছোট্ট হাতিয়ার। হেবোর কানটা তখনও ধরা আছে অবিনাশবাবুর হাতে। কানে প্রচণ্ড টান লাগছে, তবু হেবো বুঝতে পারে জিনিসটা কী। রহস্য-লহরী সিরিজের অনেক বইতে ছবি দেখা আছে তার।

মুসলমান ভদ্রলোক পরিষ্কার বাঙলা ভাষায় বলে ওঠে—‘আমার দিকে এক পা এগিয়ে এলে আমি কিন্তু তার খুলি উড়িয়ে দেব! হু-টা গুলি ভরা আছে এতে—ছজনকে না মেরে ধরা দেব না আমি! দরজা ছেড়ে সরে দাঁড়াও সকলে!’

কামরার সূচিভেদ্য নিস্তব্ধতা। সে নৈঃশব্দের মধ্যে শোনা যাচ্ছে একমাত্র বাক্কে-শয়ান ভোজপুরীর নাসিকাস্বনি।

ট্রেন হুইসল দিল। পরমুহূর্তেই দুলে উঠল ট্রেনটা। জল আর কয়লা নিয়ে নতুন উদ্যমে ইঞ্জিন গাড়িকে টানছে। গাড়ি ছাড়ল। লোকটা টেঁচিয়ে ওঠে—‘দরজা ছেড়ে সরে দাঁড়াও। চলতি ট্রেন থেকে যে নামবে সে-ই গুলি খাবে কিন্তু!’

বেশির ওপর থেকে লাফ দিয়ে নামে সে। ছুটে যেতে চায় দরজার দিকে। সেই শুভ মুহূর্তেই ভোজপুরীর ঘুমন্ত আড়াইমিনি বপুখানি উন্টে পড়ল পশ্চিমা মুসলমানটির ঠিক মাথার ওপর। দুজনেই উন্টে পড়ল মেঝেতে। এই সুযোগে একজন পুলিশ টেনে দিয়েছে অ্যালার্ম চেনটা। লিখতে যতক্ষণ লাগল তার চেয়ে অনেক তাড়াতাড়ি ঘটেছে ঘটনাটা। হুমড়ি খেয়ে পড়া মানুষদুটো যখন ফের উঠে দাঁড়াল তখন পশ্চিমা ভদ্রলোকের হাতে উঠেছে লোহার হ্যান্ডকাফ আর রিভলভারটা চলে এসেছে ভোজপুরীর দৃঢ়মুষ্টিতে। এত অতর্কিতে ব্যাপারটা ঘটে গেল যে সামান্য পুলিশ অফিসার দু-জন তো হার, স্বয়ং শার্লক হেবো পর্যন্ত তাজ্জব। ভোজপুরী তাঁর পুরুষ্ট গৌফজোড়া খুলে ফেলতেই অফিসার দু-জন একসঙ্গে বলে ওঠেন—‘স্যার! আপনি?’

ভোজপুরীবেশী আবগারি পুলিশের বড়-সাহেব বললেন—‘হ্যাঁ, আমিই; আসানসোল থেকে ওকে ওয়াচ করতে করতে আসছি। আর তুমি মুখুজে, তুমি এত বড় ইডিয়ট, বাঙালি ধরে ধরে শুধু নাম জিজ্ঞাসা করছ?’

মুখার্জিসাহেব মাথা চুলকে বলেন, ‘না স্যার, মানে, ইয়ে...এ খোকা শুধু আন্দাজে ঢিল ছুঁড়ে...’

লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়ায় হেবো। তার কান অনেক আগেই বন্ধনমুক্ত হয়েছিল। বলে, ‘খোকা নয়, বলুন শার্লক হেবো! আন্দাজে ঢিল ছোঁড়ার অভ্যাস শার্লক হেবোর নেই। আমার প্রত্যেকটি সিদ্ধান্ত প্রমাণের ওপর প্রতিষ্ঠিত!’

ভোজপুরী-বেশী বড়সাহেব ওর পিঠে একটা হাত রেখে বলেন,—‘বল তো ভাই, কী করে বুঝলে তুমি?’

—‘বলছি।’ হেবো উঠে দাঁড়ায় বেঞ্চির ওপর। হাফপ্যান্টের দুই পকেটে দুটো হাত চালিয়ে দেয়। গোয়েন্দা-গল্পের শেষ দিকে এটি গোয়েন্দার অবশ্যকর্তব্য, সে বিষয়ে তার জ্ঞান আছে। কোন-কোন ক্লুর সাহায্যে সে অপরাধীকে চিনে ফেলেছে এটা বুঝিয়ে দেওয়াও গোয়েন্দার কর্তব্যভূক্ত (ঠিক ঐ ভঙ্গিতে শার্লক হোমসের ছবি দেখেছিল হেবো কোনো বইতে—অবশ্য তাঁর গায়ে ছিল ওভারকোট, মাথায় টুপি আর মুখে পাইপ—সেসব কিছুই হেবোর নেই)। হেবো গম্ভীরভাবে বলে, ‘রেল কোম্পানির ঐ বিজ্ঞপ্তিটা হাওড়া স্টেশনেই নজরে পড়েছিল আমার—“চোর জুয়াচোর ও পকেটমার নিকটেই আছে।” তখন থেকেই আমি সকলকে সন্দেহের চোখে দেখতে শুরু করি। তারপর দেখলাম, লেখা আছে—“নিকটেই আছে।” আমার প্রথম সন্দেহ হয়েছিল ঐ সাধুবারার ওপর। কিন্তু সে তো আমার নিকটেই নেই, সে আছে বেশ খানিকটা দূরে!’

এবার হো-হো করে হেসে ওঠে সবাই। মুখার্জিসাহেব বলেন, ‘দেখলেন স্যার, খোকার কাণ্ড।’

কিন্তু আবগারি বিভাগের বড়-সাহেব তখনও শুনতে চান হেবোর যুক্তি। বলেন, ‘তা যেন হল, কিন্তু তোমার নিকটে তো অনেকেই ছিল—ওকেই বা দেখালে কেন?’

‘বলছি। আমি প্রথমেই লক্ষ্য করি, আসানসোলে মেজদা যখন ওকে বললে যে বসবার জায়গা নেই, তখন ও মেজদাকে ঝেঁ ভাষায় জবাব দিল তার বিন্দুবিসর্গ বোঝেনি মেজদা। মেজদা যে কিছুই বোঝেনি তা বুঝতে পেরেছিলাম তার ফ্যালফ্যাল-করা চাউনি দেখে (এখন অবশ্য মেজদা যেভাবে তাকাচ্ছে তাকে অগ্নিদৃষ্টি বলা উচিত!)। তখনও কিন্তু উনি সরলভাষায় কিছু বললেন না। বাঙলা দেশে পশ্চিমারা বাঙালির সঙ্গে, বিশেষ করে মেজদার মতো ছেলেমানুষের সঙ্গে (মেজদার চেহারাটা এখন ফটো তুলে রেখে দেবার মত!), যে ভাষায় কথা বলে, সেটা সাধারণত হিন্দি-বাঙলার একটা খিচুড়ি ভাষা। “খোঁকি তুমি শ্বশুরবাড়ি যাবিস্” গোছের ভাষা। কিন্তু তা না বলে ইনি বললেন খাঁটি হিন্দি অথবা উর্দু। সিদ্ধান্ত : ইনি বাঙলা ভাষা একেবারেই জানেন না।

‘তার একটু পরেই লক্ষ্য করে দেখি, পাঞ্জাবী ভদ্রলোকের পরিত্যক্ত আসনে জুত করে বসতে পাওয়ার পরই উনি বাবার আনন্দবাজারখানা টেনে নিলেন। যেহেতু ইতিপূর্বে সিদ্ধান্ত হয়েছে যে উনি বাঙলা ভাষা জানেন না, ফলে অনুসিদ্ধান্ত : উনি খবরের কাগজের ছবি দেখছিলেন। বেশ কথা। কিন্তু শেষ রাত্রে গাড়ি যখন টানেলের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছিল তখন আমার ঘুম ভেঙে যায়। তখন হঠাৎ লক্ষ্য হয়, কামরায় দু-জন লোক জেগে আছেন। তার মধ্যে একজন ঐ ভদ্রলোক—তিনি তখনও খবরের কাগজ দেখছেন। আসানসোল থেকে গ্র্যান্ড-কর্ড লাইনে টানেল অন্তত তিন-চার ঘণ্টার পথ। এতক্ষণ ধরে কেউ খবরের কাগজে ছবি দেখে না। সিদ্ধান্ত : উনি আনন্দবাজারখানা পড়ছিলেন। তাহলে সবটা মিলিয়ে কী দাঁড়াল? ইনি বাঙলা ভাষা বেশ ভালই জানেন—অক্ষর পরিচয়ও আছে; কিন্তু সেটা প্রকাশ করতে অনিচ্ছুক। ইনি রাত জেগে আনন্দবাজার পড়তে পারেন, আর একটি বাঙালি বাচ্চার সঙ্গে বাঙলায় কথা বলতে পারেন না। সম্ভবত ইনি বাঙালি, অথচ পশ্চিমার বেশে রেল-ভ্রমণ করেন। ঐর সঙ্গে আছে একটি সুটকেস—বসবার ভাল জায়গা পাচ্ছেন না—তবু সেই সুটকেসটাকে বাস্কের ওপর না তুলে দিয়ে পাশে নিয়ে বসে আছেন। এদিকে পুলিশের ক্লু—চোর বাঙালি, এক সুটকেস আফিং নিয়ে পালাচ্ছে। এরপর আর কী বাকি থাকে স্যার আপনিই বলুন!’

মুখার্জিসাহেবের মুখের হাসি ততক্ষণে মিলিয়ে গিয়েছে। তাঁর দিকে ফিরে ভোজপুরীবেশী বড়সাহেব ইংরাজিতে বললেন, ‘আমার ইচ্ছে করছে এই ছেলেটির কাছে তোমাকে ছয় মাসের জন্য শিক্ষানবিশ করে রেখে দিতে!’

মুখার্জিসাহেব মাথাটা আর তুলতে পারেন না।

আর হেবোর দিকে ফিরে উনি বলেন, ‘শার্লক হোমস্ তোমাকে উদ্ধুদ্ধ করেছেন—আমি আশীর্বাদ করছি, তুমি তাঁর মতো সার্থক সত্যাত্মবোধী হও। তবে বড় হয়ে যখন কোনান ডয়েল পড়বে তখন জানতে পারবে শার্লক হোমস্ শুধু বড় গোয়েন্দাই ছিলেন না; নানান বিষয়ে তাঁর ছিল প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য। বড় ডিটেকটিভ হতে গেলে প্রথমে তোমাকেও খুব ভাল করে লেখাপড়া শিখতে হবে। কাল রাতে তুমি যেমন সকলকে লক্ষ্য করেছ, তেমনি আমিও সকলকে লক্ষ্য করতে করতে এসেছি; যদিও সারা রাতই আমার নাক ডেকেছিল। তাই এর সূটকেসের ভেতর লুকানো আফিংটাকে যেমন স্পষ্ট দেখতে পেয়েছি, তেমনি তোমার হাফপ্যান্টের ডান পকেটে লুকানো “হত্যাকারী কে?” বইটাকেও দেখতে পেয়েছি আমি। যদি শার্লক হোমসের মতো বড় গোয়েন্দা হবার সত্যিই ইচ্ছা থাকে তাহলে প্রথমেই ঐ সব বাজে গোয়েন্দা-গল্পের বই পড়ার অভ্যাস তোমাকে ছাড়তে হবে। যাই হোক, আজকের দিনে তোমার সাফল্যের চিহ্নস্বরূপ তোমাকে উপহার দিলাম আমার এই হাতঘড়ি।’

নিজের মণিবন্ধ থেকে খুলে নিয়ে দামি রিস্টওয়াচটা তিনি পরিয়ে দিলেন হেবোর হাতে।

*

*

*

হেবো যদি আবগারি বিভাগের ঐ বড়সাহেবের উপদেশ মেনে নিয়ে তার গোয়েন্দাগিরির খেয়াল ত্যাগ করতে পারত তাহলে আমার গল্পও শেষ হত এখানে। বলতে পারতাম, এরপর থেকে হেবো মন দিয়ে পড়াশুনো শুরু করল। বলতে পারতাম—হেবোর গোয়েন্দা-গল্প শুনতে হলে আরও বছর আট-দশ পরে তোমাদের আসতে হবে ভাই।

কিন্তু হেবো মনেপ্রাণে ওঁর কথাটা গ্রহণ করতে পারেনি। পারবে কোথা থেকে? অত বড় সাফল্যে তার মাথাটা ঘুরে গেল। খবরের কাগজে সংবাদটা ছাপা হয়েছিল—‘বালকের প্রত্যুৎপন্নমতিত্বে আফিংচোর ধৃত’ এই শিরোনাম দিয়ে। ছুটির পর রীতিমত সাড়া পড়ে গেল ওর স্কুলে। বন্ধুরা সবাই ওকে নিয়ে কদিন খুব হৈ-চৈ করল। এমনকি হেডমাস্টার-মশাই পর্যন্ত ওকে ডেকে নিয়ে ওর বুদ্ধির তারিফ করলেন। কিন্তু হেডমাস্টার-মশাইয়েরও ঐ দোষ! শুধু প্রশংসা করেই ক্ষান্ত হলেন না তিনি, বললেন—‘বড় গোয়েন্দা হতে গেলে জ্ঞান-বিজ্ঞানের নানান বিষয়ে অধিকার থাকা চাই’। বাড়িতেও খাতির বেড়ে গেল হেবোর। মেজদা আর সাহস করে কোনো কথাই বলে না। গর্বে হেবোর মাটিতে পা পড়ে না! ডিটেকটিভ বইয়ের প্রতি একটা অদ্ভুত নেশায় পেয়ে বসল তাকে। রাজ্যের গোয়েন্দাগল্পের বই যোগাড় করে সে পড়তে থাকে রাত জেগে। সেবার পরীক্ষায় আরও খারাপ ফল হল তার। বাবা বকলেন, কাকাও দুঃখ প্রকাশ করলেন; কিন্তু হেবোর মনে কোনও দুঃখ নেই, বলে—‘পাস তো করেছি!’

ক্লাস-প্রমোশন নিয়ে হেবো এবার নাইনে উঠেছে। ওর কাকা বারবার বললেন—‘হেবো, এই দুটো বছর একটু মন দিয়ে পড়াশুনো কর। সায়েন্স নিয়েছিস, ফার্স্ট ডিভিশন না পেলে কোনো ভাল কলেজে সীট পাবি না।’

হেডমাস্টার-মশাইও তাকে কাছে ডেকে নিয়ে অনেক ভালো ভালো উপদেশ দিলেন, বললেন—‘তোমার মতো বুদ্ধিমান ছেলে থাকতে এ বছর আমার স্কুল থেকে যদি কেউ স্কলারশিপ না পায়, তাহলে সে দুঃখ আমার চিরকাল থাকবে।’

হেবো মনে মনে বললে, ‘স্কলারশিপে আর কটা টাকা হবে? তার চেয়ে একটা বড় চুরির কিনারা করতে পারলে অনেক বেশি টাকা পুরস্কার পাওয়া যায়।’

হেডমাস্টার-মশাই বলেন, ‘আমাকে কথা দাও, স্কুল থেকে পাস করে যাবার আগে আর গোয়েন্দাগিরি করবে না তুমি।’

হেবো বাধ্য হয়ে বলে, ‘আচ্ছা বেশ।’

এই সময়ে হেবো ডাকে একখানা চিঠি পেল। হাতের লেখা অপরিচিত কিন্তু চিঠি পড়ে অনায়াসেই বুঝতে পারে কে লিখেছেন তাকে। চিঠিখানায় লেখা ছিল—

কল্যাণীয়েষু

তুমি আমায় ভুলে গেছ কিনা জানি না। আমি কিন্তু তোমাকে ভুলিনি! তোমার মেসোমশাই অজিতেন্দ্রবাবু আমার সহকর্মী। তাঁর কাছেই তোমাদের সব খবর পাই। তাঁর কাছেই শুনলাম, এ বছর

ক্লাস-পরীক্ষায় তুমি খুব সুবিধা করতে পারনি। প্রমোশন পেয়েছ বটে, কিন্তু সংস্কৃতে নাকি তোমার পাস-নম্বর ছিল না। মনে হয় আমার কথা তুমি কানে তোলনি। মন দিয়ে পড়াশুনা করলে এত খারাপ ফল কখনও হতে পারে না। আমি তোমার ওপর অনেক ভরসা করেছিলাম। তুমি আমাকে নিরাশ করেছ। এখন আবার বলছি, ঐ সব বাজে ডিটেকটিভ বই পড়া ছেড়ে পড়াশুনায় মন দাও। জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয় ভালভাবে জানা না থাকলে কখনও বড় সত্যাত্মবোধী হওয়া যায় না। জান তো, —স্বামী বিবেকানন্দ বলেছিলেন, চালাকির দ্বারা কখনও কোনো মহৎ কাজ হয় না। আশা করি এবার পরীক্ষার ফলাফল দেখে তোমার চৈতন্য হবে।

আমাকে চিনতে পারলে তো? নেহাত না পারলে, তোমার বাঁ হাতের কজির কথা কান পেতে শোন। আমার ঠিক-ঠিক পরিচয় সে টিক্-টিক্ করে বলে দেবে।

আশীর্বাদক
ইতি

*

*

*

এই চিঠিখানা পেয়েও কিন্তু হেবোর কোনো ভাবান্তর হল না। সে তখন মেতে আছে তাদের স্কুলের থিয়েটার নিয়ে! পুরস্কার বিতরণী সভায় শহরের বিশিষ্ট অতিথিরা দল বেঁধে আসেন। ছেলোদের গার্জেনরাও নিমন্ত্রিত হন। প্রতি বছরই এই দিনে একটা বড় রকমের হৈ-চৈ হয়। এবার স্থির হয়েছে, ছেলেরা অভিনয় করবে রবীন্দ্রনাথের নাটক—মুকুট। হেবো ভাল অভিনয় করে, সব গুণই আছে তার। ছেলেরা কেউ-কেউ বলে, ওকে মেজকুমার ইন্দ্রকুমারের পাট্টেই মানাবে। ঐটেই সবচেয়ে ভাল পাট্ট। কিন্তু হেডমাস্টার-মশাই বললেন, ‘না, হেবো করবে রাজধরের পাট্ট—ঐটেতেই ওকে ঠিক মানাবে।’

কথাটা হেবোর ভাল লাগেনি। এ যেন তাকে অপমান করতেই বলা। রাজধর হচ্ছে কুচক্রী, বদমায়েশ। কিন্তু থিয়েটার করার নিয়ম হচ্ছে—কোন পাট্ট পেয়েছ তা নিয়ে মনে কোনো খুঁতখুঁতানি না রেখে যেটা পেয়েছ সেটাই ঠিকমত রূপায়িত করা। এটাই হচ্ছে নাটক অভিনয়ের মূল কথা। সবাই যদি নায়ক হতে চায়, তাহলে নাটক হয় না—হয় একটা মন-কষাকষির পণ্ডশ্রম। তাই হেবোও মনে কোনো খেদ না রেখে ছোট রাজকুমার রাজধরের পাট্টটা মুখস্থ করে নিল।

গোল বাধল রংনাটকে নিয়ে। রতন হেবোদের চেয়ে এক ক্লাস নিচুতে পড়ে। খুব বড়লোকের ছেলে। ওর বাবা নাকি কোথাকার কোন স্টেটের রাজা ছিলেন। এখন অবশ্য রাজ্য নেই—ভারতবর্ষের সব স্টেটের রাজ্যই এখন ভারত সরকার নিয়েছেন। সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের কীর্তি এটা, হেবো জানে। তা হোক, তবু রতনরা খুব বড়লোক। ওর বাবা যে এককালে রাজা ছিলেন এটা কিছুতেই ভুলতে পারে না রতন। ক্লাসের ছেলেরা তাকে সম্মিহ করে চলে। কালো রঙের একটা প্রকাণ্ড মোটর গাড়ি ওকে প্রত্যহ স্কুলে পৌঁছে দিয়ে যায়—আবার ঠিক চারটের সময় ওকে নিতে আসে।

রতনকে দেওয়া হয়েছিল ছোট রাজকুমার রাজধরের বন্ধু ধুরন্ধরের চরিত্র। অর্থাৎ হেবোর সঙ্গেই তাকে অভিনয় করতে হবে। রতন বলে—‘দেখিস না কী কাণ্ড করি আমি! তোরা তো সব টিনের তরোয়াল ঘোরাবি। আমি নিয়ে আসব সত্যিকারের তরোয়াল! সোনার কাজ করা বাঁট—ঈয়া বড়! আমার বাবার তরোয়াল!’

সবাই অবাক হয়ে শোনে।

হেবো বন্ধুদের বলে, ‘যতসব চালবাজি! সত্যিকারের তরোয়াল কখনও থাকতে পারে নাকি ওর বাবার! সে-সব সর্দারজি কবেই কেড়ে-কুড়ে নিয়েছেন।’

রতন বলে, ‘আচ্ছা দেখা যাবে!’

ক্রমে এগিয়ে আসে নির্দিষ্ট দিন। ড্রেস-রিহাসালের দিনে সবাই জমায়েত হয়েছে স্কুল ছুটির পর। কাল থিয়েটার, আজ তাই সেজেগুজে সবাই মহড়া দেবে। স্কুলের বড় হলঘরটায় স্টেজ বাঁধার কাজ শেষ হয়েছে। কয়েকটি ছেলে লাল নীল কাগজের শেকল বানিয়ে ঘরের এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্তে

টাঙিয়ে দিচ্ছে। যারা অভিনয় করবে তাদের সাজ-পোশাক পরানোর কাজ হয়ে গিয়েছে। বাঙলার স্যার যখন রতনের কোমরে ভাড়া-করে-আনা টিনের তরোয়ালটা বেঁধে দিতে গেলেন তখন রতন বলে ওঠে, ‘আমাকে স্যার ওসব টিনের তরোয়াল দিতে হবে না। আমার সত্যিকারের তরোয়াল চাই।’

বাঙলা স্যার অবাক হয়ে বলেন, ‘সে আবার কী রে রতনা! সত্যিকারের তরোয়াল আমি কোথায় পাব?’

ঠিক সেই সময়েই স্কুলের গেটে এসে থামল কালো রঙের প্রকাণ্ড গাড়িটা। উর্দিপরা একজন চাপরাশি ‘হলে’ ঢুকে মাস্টারমশাইকে আভূমি নত হয়ে সেলাম করে। তার হাতে একটা প্রকাণ্ড তরোয়াল। রতন হাত বাড়িয়ে তরোয়ালটা নেয়। সকলেই ছুটে আসে জিনিসটা দেখতে। সত্যিই দেখবার মতো জিনিস বটে! বাঙলা-স্যার খাপ থেকে সেটাকে বার করতেই সকলের চোখ বলসে গেল যেন। ইয়া লম্বা ঝকঝকে একটা ইস্পাতের তরোয়াল। মুঠটায় সোনালি কাজ করা। খাপটার গায়েও নানান কারুকার্য। রমেশবাবু ইতিহাস পড়ান, সেটা নেড়ে-চেড়ে বললেন—‘এ যে দেখছি ভিক্টোরিয়া যুগের সোর্ড! এ তো ত্রিপুরার সৈন্যদলে বেমানান হবে!’

মুখ শুকিয়ে যায় রতনের। হেডমাস্টারমশাই বলেন, ‘আহা, তা হোক। অত খুঁটিয়ে আর কে দেখতে যাচ্ছে! বেচারি অত শখ করে এনেছে! দিন রমেশবাবু, ওটা ওর কোমরে বেঁধে।’

রমেশবাবু অগত্যা সেটা রতনের কোমরের বেল্ট থেকে ঝুলিয়ে দিলেন। বাঙলা-মাস্টারমশাই তবু বলেন, ‘কিন্তু আরও একটা কথা। রাজপুত্রদের তরোয়ালের চেয়ে এটা অনেক লম্বা আর অনেক দর্শনধারী। ধুরন্ধর সামান্য সৈনিক,—এটা খুব খারাপ দেখাবে না কি?’

হেবো তাড়াতাড়ি বলে ওঠে, ‘হ্যাঁ স্যার, তার চেয়ে ওটা সুবলদার কোমরে বেঁধে দিন। সুবলদা ইন্দুকুমারের পার্ট করছে—ও-ই আসলে গল্পের হিরো। তা ছাড়া সুবলদা অনেক লম্বা। ঠিক ফিট করে যাবে।’

সুবল ফাস্ট ক্লাসে পড়ে। তালগাছের মতো মাথায় বেড়েছে খালি। লোলুপ দৃষ্টিতে বেচারি তাকিয়ে দেখছিল তরোয়ালটার দিকে।

রতন প্রতিবাদ করে, ‘ঈস! এ আমার বাবার জিনিস। আমি আর কাউকে দেব কেন?’

হেডমাস্টারমশাই বলেন, ‘কিন্তু ওটা যে মাপে তোমার পক্ষে অনেক বড় হচ্ছে রতন।’

‘হোক। আমার বাবার তরোয়াল আমি কাউকে দেব না।’

সকলেই লজ্জা পেল ওর বেহায়াপনায়। হেবো মর্মান্তিক চটে গেল। কিন্তু মাস্টারমশাইরা সকলেই রয়েছেন। তাঁরা আর কিছু বললেন না। অগত্যা ওটা রতনের কোমরেই বাঁধা থাকল।

মহড়া শেষ হয়ে গেলে বন্ধুদের মধ্যে আবার ঐ নিয়ে গুজগুজ ফুসফুস শুরু হয়ে গেল।

ক্লাস টেনের নবীনদা বলে, ‘রতনাটা সেলফিশ নাম্বার ওয়ান। ওর উচিত ছিল ওটা সুবলকে দেওয়া।’

গোবরা বলে, ‘বিশেষত যখন হেড স্যার পর্যন্ত বললেন—’।

ট্যানা বলে, ‘রতনাটাকে জন্ম করা যায় না?’

—‘কী করে?’

—‘ধর, কাল যদি ওর তরোয়ালখানা হঠাৎ গায়েব হয়ে যায়?’

—‘সে অসম্ভব। ও তো তরোয়ালখানা সারাক্ষণ কোমরে বেঁধে ঘুরে বেড়াবে। তাছাড়া তরোয়াল চুরি গেলেই হেড-স্যার শার্লক হেবোকে তলব করবেন, চোর খুঁজে দিতে। আর তৎক্ষণাৎ আমরা সদলবলে ধরা পড়ে যাব।’

হো-হো করে হাসল হেবো।

ট্যানা বলে, ‘তার চেয়ে চল, সবাই মিলে ড্রইং মাস্টারমশায়ের কাছে গিয়ে ব্যাপারটা খুলে বলি। তিনি কী বুদ্ধি দেন শোনা যাক।’

—‘তাই চল তাহলে।’

সদলবলে ওরা এসে হাজির হল ড্রইং ক্লাসে। স্কুলের ছুটি হয়ে গিয়েছে অনেকক্ষণ; কিন্তু ড্রইং মাস্টারমশাই বাড়ি যাননি। তিনি একগাদা পীসবোর্ড কেটে, শল্মা-চুম্বক-রাঙতা মুড়ে একটা

মুকুট বানাচ্ছিলেন। ত্রিপুরা রাজার রাজমুকুট—কাল থিয়েটারে লাগবে। ওরা অনেকক্ষণ ধরে মুকুট বানানো দেখল। কী সুন্দর কারুকার্য করেছেন তাতে ড্রইং স্যার।

শেষ পর্যন্ত ওরা সব কথা খুলে বলল ড্রইং স্যারকে। ধৈর্য ধরে তিনি সবটা শুনলেন এবং শেষ পর্যন্ত বললেন, ‘তোমরা ঠিকই বলেছ, রতনের পক্ষে এটা অন্যায্যই হয়েছে। টীম-ওয়ার্কের কথা না মনে রাখলে কখনও ভাল থিয়েটার করা যায় না!’

ট্যানা বলে, ‘তাছাড়া হেড-স্যারও ওকে বললেন তরোয়ালটা সুবলকে দিতে।’

ড্রইং স্যার বলেন, ‘ঠিকই তো। তাঁর কথা অমান্য করা খুবই অন্যায্য হয়েছে।’

হেবো আর সহ্য করতে পারে না। বলে ওঠে, ‘অন্যায় যে হয়েছে, সে তো সবাই মেনে নিয়েছে স্যার। এখন অন্যায়ের প্রতিকার কী করা যায় বলুন।’

ড্রইং স্যার অনেকক্ষণ চোখ বুজে কী যেন চিন্তা করলেন। তারপর বলেন, ‘দেখ, একটা কথা আছে—যে সয়, সে রয়।’

ব্যাস্, এককথায় মামলা ডিসমিস।

হেবো কিন্তু ছোড়নেওয়ালা নয়। সে বলে, ‘ও ছাড়া আরও একটা কথা আছে স্যার—অন্যায় যে করে আর অন্যায় যে সহ্য—তব ঘৃণা যেন তারে তৃণসম দহে।’

ড্রইং স্যার অনেকক্ষণ চুপ করে কী যেন ভাবলেন। তারপর বললেন, ‘হ্যাঁ, ঐরকম একটা কথাও আছে বটে। যাক, এখন তোমার যাও। আমি মুকুটটা শেষ করি।’

ড্রইং মাস্টারমশাই ঐ রকম আপনভোলা মানুষ।

বন্ধুরা হেবোকেই মুকুটের পাকড়াও করে। বলে, ‘তুই একটা যা হয় বিহিত কর।’

হেবো বলে,—‘দেখি ভেবে!’

*

*

*

পরদিন প্রাইজ ডিস্ট্রিবিউশন। সন্ধ্যা ছটা তিন মিনিটে অনুষ্ঠান শুরু হবে। ছটা তিন মিনিট কেন? তার একটা ইতিহাস আছে। আজ এগারো বছর ধরে এই ছটা তিন মিনিটেই অনুষ্ঠান হচ্ছে। এই হেডমাস্টারমশাই আসার পর থেকে। তিনিই এ নিয়মটা চালু করেছেন। আগে এমন বহুবার হয়েছে যে ছাত্ররা সেজেগুজে তৈরি হয়ে আছে, অথচ প্রেক্ষাগৃহে যথেষ্ট জনসমাগম হয়নি বলে অভিনয় শুরু করা যাচ্ছে না। নিমন্ত্রণ-পত্রে ‘ছটা’ লেখা থাকলে সকলেই ধরে নিনেন—বাঙালির টাইম, এ সাড়ে ছটা নাগাদ শুরু হবে আর কি। আবার কোনো-কোনো বছর ছেলেরাও ঠিক সময়ে তৈরি হত না—ভাবত ঠিক সময়ে তৈরি হয়ে আর কী লাভ? দর্শকরা তো সেই সাড়ে ছটার আগে আর আসছেন না!

ছাত্র আর দর্শকদের সময়ানুবর্তিতার মূল্যটা বুঝিয়ে দিতে হেডমাস্টার-মশাই একটা ফন্দি বার করলেন। পরের বছর নিমন্ত্রণপত্রে ছাপা হল—‘অনুষ্ঠান শুরু হবে ইন্ডিয়ান স্ট্যান্ডার্ড টাইম সন্ধ্যা ছটা বেজে তিন মিনিটে।’

যাঁরা নিমন্ত্রণপত্র পেলেন তাঁরা একটু অবাক হলেন। ব্যাপার কী? ছটা নয়, সওয়া-ছটা বা সাড়ে-ছটা নয়—একেবারে ছটা বেজে তিন মিনিটে প্লে শুরু হবে মানে? কেউ কেউ প্রশ্নও করলেন হেডমাস্টার-মশাইকে—‘এ আবার কী মশাই? ছটা বেজে তিন মিনিটে প্লে শুরু হবে মানে?’

হেডমাস্টার-মশাই গম্ভীর হয়ে উত্তরে বলেছিলেন, ‘ছটা বেজে তিন মিনিট মানে সাতটা বাজতে সাতাত্ত মিনিট।’

সে বছর কৌতূহলের আতিশয্যে দর্শকেরা দেখতে এলেন ব্যাপারটা। ব্যাপার কিছুই নয়, হেডমাস্টার-মশাই ছটা বাজতে দু মিনিটে প্রথম ঘণ্টা বাজাবার ব্যবস্থা করলেন, এবং পর্দা উঠে গেল ইন্ডিয়ান স্ট্যান্ডার্ড টাইমের ঠিক ছটা বেজে তিন মিনিটে।

সেই থেকে আজ এগারো বছর ধরে এ স্কুলের ট্র্যাডিশন সন্ধ্যা ছটা বেজে তিন মিনিটে অভিনয় শুরু করা। সেই বছর থেকে দর্শকেরা জেনে গিয়েছেন, ছটা বেজে পাঁচ মিনিট পরে হলে ঢুকলে দুই মিনিটকালের অভিনয় দেখা থেকে তাঁরা বঞ্চিত হবেন।

পাণ্ডুচ্যালিটি রক্ষা করার এ ব্যবস্থাটা বেশ মজার, নয়?

যাক, যা বলছিলাম। যারা অভিনয় করবে তারা চারটের মধ্যে সবাই হাজিরা দিয়েছে। ডুইং স্যার আর রমেশবাবু একের পর এক মেক-আপ দিয়ে যাচ্ছেন। সাদা সাদা চুল দাড়িতে ক্রাস ইলেভেনের হারানদাকে আর চেনাই হচ্ছে না, মনে হচ্ছে ত্রিপুরাবাহিনীর বৃদ্ধ সেনাপতি স্বয়ং ঈশা খাঁ। যুবরাজের সাজপোশাকও পরা হয়ে গিয়েছে। তারিণীদা সেজেছে ত্রিপুরাধিপতি। বলমলে সাজপোশাকে মুকুট মাথায় ঘুরঘুর করছে। এবার সুবলদা বসেছে ইন্দ্রকুমারের মেক-আপ নিতে। রতন সকলের আগে ধুরন্ধরের মেক-আপ নিয়ে বিরাট তরোয়ালটা কোমরে বেঁধে স্টেজের ওপর পায়চারি করে পাট মুখস্থ করছে। অতিকায় তরোয়ালটা ঠকঠক করে মাটিতে ঠোকা খেয়ে তাল দিয়ে যাচ্ছে সঙ্গে সঙ্গে। নিচু ক্রাসের ছেলেগুলো বারে বারে উঁকি দিচ্ছে গ্রীনরুমের ভেতর, আর উঁচু-ক্রাসের ছেলেদের ধমক খেয়ে বারে বারে ছুটে পালাচ্ছে।

যারা ভলান্টিয়ার হয়েছেন, তাদের জামায় একটা করে রিবন-বাঁধা ব্যাজ। বুক, তথা ব্যাজ ফুলিয়ে তারা ঘন ঘন আসছে প্রেক্ষাগৃহ থেকে গ্রীনরুমে! খবর দিয়ে যাচ্ছে ‘হলে’ কত লোক হয়েছে, কে কে এসেছেন। হেডমাস্টারমশাই একবার হস্তদস্ত হয়ে এসে বলে গেলেন, ‘ফারদার এইটিন মিনিটস্ বয়েজ! ছটা বাজতে কুড়ি হয়েছে, ঠিক ছটা বাজতে দু’মিনিটে ওয়ার্নিং বেল পড়বে। তার মধ্যে একেবারে রেডি হওয়া চাই। ছটা তিনে পর্দা উঠবে মনে থাকে যেন, আর ইউ অল রেডি?’

এরা বলে, ‘নিশ্চিত থাকুন স্যার, আমরা রেডি।’

বস্তুত তখনই সবাই তৈরি। সেই মুহূর্তেই পর্দা ওঠালে ওরা অভিনয় শুরু করতে পারে। ফলে মিনিট কুড়ি আগেই ওরা তৈরি হয়ে গিয়েছে। স্বস্তির নিশ্বাস পড়ল রমেশবাবুর।

হঠাৎ তারিণী এসে বলে, ‘স্যার, আমার মুকুট?’

—‘মুকুট? সে তো তোমার মাথায় পরিয়ে দিয়েছিলাম।’

—‘আমার মাথায় কিছু নেই স্যার!’

রমেশবাবু তখন একজন প্রতিহারীর পাগড়িটা খুলে নতুন করে বাঁধছিলেন, হেসে বললেন, ‘সে তো পরীক্ষার খাতা দেখলেই বোঝা যায়। কিন্তু মাথার ওপর থেকে মুকুট হারিয়ে যায়, কেমনতর মহারাজা তুমি?’

কিন্তু ব্যাপারটা যে রসিকতার নয়, তা বোঝা গেল অল্প পরেই! মুকুট কোথাও পাওয়া গেল না। সর্বনাশ! খোঁজ খোঁজ খোঁজ! স্টেজের ওপর নেই, গ্রীনরুমে নেই, আশেপাশে কোথাও পড়ে নেই। অত বড় জিনিসটা এতগুলো লোকের চোখের ওপর দিয়ে কর্পুরের মতো উপে তো যেতে পারে না? তাহলে? সবাই মিলে তারিণীকে গালাগালি করতে থাকে। এত বড় আহাম্মক যে, মাথার ওপর থেকে মুকুট হারিয়ে যায়, টের পায় না? খবর পেয়ে হেড-স্যার ছুটে এলেন। তাঁর মাথা-ভরা টাক, নাহলে হয়ত পটপট করে মাথার চুলই ছিঁড়তেন তিনি। বলেন, ‘শেম, শেম, বয়েজ! এতবড় দায়িত্বজ্ঞানহীন তোমরা! আর এগারো মিনিট মাত্র বাকি আছে, এখন “মুকুট” নাটকে মুকুটই নেই? যেমন করে পার খুঁজে বার কর! ঠিক ছটা তিন মিনিটে আমি পর্দা তুলব। যদি এর ভেতর খুঁজে না পাও—তাহলে আমি নিজে স্টেজে গিয়ে অ্যানাউন্স করব যে আমার ছেলেদের দায়িত্বজ্ঞানহীনতার জন্য অভিনয় শুরু হতে দেরি হবে।’

কী কেলঙ্কারি!

এইসময়ে কে এসে বলল, ‘গভর্নিং বডি’র প্রেসিডেন্ট এসেছেন স্যার।’

হস্তদস্ত হয়ে বেরিয়ে গেলেন হেডমাস্টারমশাই।

সকলের মুখ শুকিয়ে গেল। সবাই মিলে দ্বিগুণ উৎসাহে খুঁজতে থাকে। রমেশবাবু এসে জেরা শুরু করেন ‘তারিণী, তোমার একেবারে কিছু মনে পড়ছে না? লক্ষ্মী বাবা, একটু ভেবে দেখবার চেষ্টা কর।’

তারিণী আমতা আমতা করে। কী জবাব দেবে ভেবে পায় না।

এবারে মহড়া নিতে এগিয়ে আসেন স্বয়ং হেডপণ্ডিতমশাই তাঁর বিশাল বপুখানি নিয়ে। স্বনামধন্য হেডপণ্ডিতমশায়ের নামে সারা স্কুল থরহরি কাঁপে। রমেশবাবুকে সরিয়ে দিয়ে বলেন, ‘ও আপনার

কর্ম নয় মশাই! অমন বাপু-বাছা করলে মুকুটের সন্ধান পেতে রাত্রি প্রভাত হয়ে যাবে। লাঠৌষধিই এক্ষেত্রে একমাত্র প্রযোজ্য, তন্ত্রিণ এর সমাধান অসম্ভব! ছিদেম, তোর যষ্টিটা দে দিকিন।’

শ্রীদাম প্রতিহারীর পাঁট করবে। ভয়ে ভয়ে ত্রিপুরাবাহিনীর প্রতিহারী তার তেলপাকা লাঠিখানা এগিয়ে দেয় হেডপণ্ডিতের দিকে। পণ্ডিতমশাই সেটা বাগিয়ে ধরে বজ্রগুণ্ডীর কণ্ঠে হাঁক পাড়েন, ‘তেরো! ইদিকে আয়!’

নবমীর বলির পাঁঠার মতো কাঁপতে কাঁপতে তারিণী এগিয়ে আসে।

—‘বল অকালকুষ্মাণ্ড, অনড়ান! মাথা থেকে মুকুট খুলেছিল একবারও? অনৃতভাষণ করলে এক ডাণ্ডায় তোর রাজাগিরি ঠাণ্ডা করে দেব!’

ত্রিপুরাধিপতি কাঁপতে কাঁপতে বলে, ‘পরচুলে ছারপোকা ছিল স্যার, তাই একবার মাত্র মাথা থেকে মুকুটটা খুলেছিলুম!’

—‘বর্ষে এস বাছাধন! মুকুট তাহলে খুলেছিলি? তখন কার হাতে দিয়েছিলি? সত্য কথা বলবি বলীবর্দ!’

—‘রতনকে সেটা ধরতে দিয়েছিলুম স্যার!’

—‘হুম! রংনা! ইদিকে আয়!’

তরোয়াল খটখট করতে করতে এবার এগিয়ে আসে রতন। ভ্যাক করে কেঁদে ফেলার আগের মুহূর্ত যেন!

—‘আরে আরে, তোর কটিবন্ধে উটি কী? ও তো টিনের তরবারি নয়? দেখি, দেখি, ওটা বার করে দে তো!’

কাঁপতে কাঁপতে রতন তলোয়ালখানা বার করে দেয়।

অস্ত্রটা হাতে পেয়ে এবার যেন মহিষাসুর হাসলেন।

—‘বাঃ! খাসা জিনিস!’

লাঠিখানা ছিদমকে ফেরত দিয়ে তরোয়ালখানাই বাগিয়ে ধরেন এবার। ঠিক যেন মহিষাসুর। চোখদুটো আগুনের ভাঁটার মতো ঘুরছে। তফাত এই যে মহিষাসুরের টিকি নেই, পণ্ডিতমশায়ের বিজয়কেতন ফ্যানের হাওয়ায় পতপত করে উড়ছে। কোথাও কিছু নেই, হুঙ্কার দিয়ে ওঠেন তিনি—‘বল ছুছুর! তারিণীর হাত থেকে মুকুট নিয়ে কোথায় রেখেছিলি?’

কাঁদো কাঁদো হয়ে রতন বলে, ‘আমি জানি না স্যার, আমি নিশ্চিত তারিণীদাকেই ফেরত দিয়েছিলাম বোধহয়!’

হুঙ্কার দিয়ে ওঠেন পণ্ডিতমশাই, ‘ওরে আমার তর্কচঞ্চু! একই নিশ্বাসে “নিশ্চিত” আর “বোধ হয়”! ঠিক করে বল অলম্বুষ! ফেরত দিয়েছিলি, না নিজের মাথায় পরেছিলি?’

—‘একবার পরেই ফেরত দিয়েছিলাম স্যার!’

—‘বর্ষে এস বাছাধন! কেন পরেছিলি? তুই বেটা ধুরন্ধর সৈনিক, তুই কোন সাহসে ত্রিপুরাধিপতির রাজমুকুট মাথায় পরলি, তাই আগে বল! না হলে ঐ ফুটন্ত জল দেখছিস?’

গ্রীনরুমের ওপাশে হাঁড়িতে চায়ের জল চড়ানো আছে। সেইদিকে নাটকীয়ভাবে পণ্ডিতমশাই তরোয়ালটা নির্দেশ করেন। রতন তাকিয়ে দেখে সেদিকে।

—‘ব্যাকরণ পড়িস? বল বলীবর্দ! নিপাতনে সিদ্ধ মানে কী?’

রংনা ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে।

—‘মুকুট খুঁজে না পেলে আজ তোকে ঐ ফুটন্ত জলে ‘নিপাতনে সিদ্ধ’ কাকে বলে তাই শেখাব!’
ভাঁ করে কেঁদে ফেললে রংনা।

হেডমাস্টারমশাই ঠিক তখনই ফিরে আসেন। ঠিক ছটা বাজে তখন। কেমন যেন শুকিয়ে গিয়েছেন তিনি এই কয় মিনিটেই। বলেন, ‘বয়েজ! এই এগারো বছরের ট্র্যাডিশন আজ নষ্ট হবে? পাণ্ডুয়ালি শুরু করতে পারব না আমরা?’

রমেশবাবু বলেন, ‘না না, আমরা ঠিক সময়েই শুরু করব। পরিমল একটা উদ্বোধনী সঙ্গীত গাইবে—তার মধ্যেই ওটা আমরা খুঁজে বার করছি।’

ঠিক ছটা বেজে তিন মিনিটে যথারীতি পর্দা উঠে গেল। কথা ছিল পরিমল গাইবে—‘সবারে করি আহ্বান’; কিন্তু সে নার্ভাস হয়ে শুরু করল—‘তোমার মহাবিশ্বে কিছু হারায় নাকো থু!।’

গান শেষ হয়ে এল, তখনও হারানো মুকুটের পাতা নেই। পরিমল উইংস-এর দিকে এক নজর দেখে নিয়ে অন্তরাটা ফিরেফিতি শুরু করে। হেডমাস্টারমশাই হঠাৎ হেবোর দিকে ফিরে বলেন, ‘একী হেবো! তুমি এমন চুপচাপ বসে আছ যে? খুঁজছ না? তোমরা থাকতে এমন একটা কাণ্ড ঘটে যাচ্ছে অথচ তোমরা হাত-পা ছেড়ে বসে আছ?’

হেবো মুখটা কাঁচুমাচু করে বলে, ‘আপনি যে আমাকে গোয়েন্দাগিরি করতে বারণ করেছেন স্যার! না হলে এমন সহজ কেসটা তো কখন সলু করে ফেলতাম!’

চমকে ওঠে সবাই। রমেশবাবু বলেন, ‘তার মানে? তুমি বলে দিতে পার মুকুট কে নিয়েছে?’

অগ্নানবদনে হেবো বললে—‘তা পারি বই কি স্যার!’

—‘কী আশ্চর্য! তবে এমন চুপ করে আছ কেন?’

—‘হেডমাস্টারমশাই যে আমাকে গোয়েন্দাগিরি করতে বারণ করেছেন!’

—‘কে? কে নিয়েছে মুকুট?’ চোখ লাল করে প্রশ্ন করেন হেডপণ্ডিতমশাই।

হেডমাস্টারমশাই তাঁকে থামিয়ে দিয়ে বলেন, ‘তার চেয়ে বড় কথা, মুকুটটা বর্তমানে কোথায় আছে তা জান?’

—‘তাও জানি স্যার!’

—‘কোথায়? কোথায়?’ হুমড়ি খেয়ে পড়ে সবাই।

গোবেচারির মতো মুখ করে হেবো হেডমাস্টারমশাইকে বলে ‘বলব স্যার?’

—‘বল, বল, আমাকে আর দক্ষে মের না!’

—‘বলছি স্যার। কিন্তু হারানো জিনিস খুঁজে দিলে আমাকে কী পুরস্কার দেওয়া হবে?’

সবাই চমকে ওঠে। রমেশবাবু আত্মসম্বরণ করে শুধু বলেন—‘পুরস্কার! তুমি কী বলছ হেবো! এই কি দর-দাম করবার সময়?’

হেবো একগুঁয়ের মতো চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে। হেডপণ্ডিতমশাই কিছু বলতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু তাঁকে থামিয়ে দিয়ে হেডমাস্টারমশাই নিজেই বলেন—‘বেশ, বল বিনিময়ে কী পুরস্কার চাও তুমি?’

অগ্নানবদনে হেবো বললে—‘আর কিছু নয়, রতন তার তরোয়ালটা সুবলদাকে দিক!’

বলা বাহুল্য রতন তাতে এককথায় রাজি।

একলহমায় হেবো গ্রীনরুমের এক অন্ধকুপের ভেতর থেকে উদ্ধার করে আনল ত্রিপুরাধিপতির অপহৃত রাজমুকুট।

হেডপণ্ডিতমশাই বলেন—‘এবার বল হেবো, কোন অনড়ান...’

—‘না, এখন নয় পণ্ডিতমশাই! ওটা আমি দেখব।—হেবো, অভিনয় শেষ হলে তুমি আমার সঙ্গে দেখা করবে।’

—‘করব স্যার!’

পরিমলের গান শেষ হতেই শুরু হয়ে গেল অভিনয়।

*

*

*

সবাই চলে গেলে হেবোর ডাক পড়ল হেডমাস্টারমশায়ের ঘরে।

সেখানে দু-জনের মধ্যে কী কথা হয়েছিল আমি জানি না। তবে খবর নিয়ে জেনেছি, হেডমাস্টারমশাই মুকুট চুরির অপরাধে স্কুলের কোনো ছেলেকে কোনো শাস্তি দেননি।

শাস্তি পেয়েছিল নিরপরাধ হেবো। সেই ডাক-পিয়ন মারফৎ। প্রাইজ ডিস্ট্রিবিউশনের দিনসাতক পর সে আবার পেল একখানা চিঠি :

‘ছিঃ হেবো! শেষে আজকাল নিজেই চুরি করে নিজেই গোয়েন্দাগিরি করছ!’

পলাশপুর পর্ব

বছর ঘুরে এল। এবার গ্রীষ্মের ছুটিতে অবিনাশবাবু কোথাও যেতে পারবেন না। ছুটির মধ্যেও তাঁকে দু-একদিন নাকি কলেজে যেতে হবে। মন-মেজাজ খারাপ হয়ে গেল হেবোর। গত বছর এমন একটা ছুটিতেই কালী যাওয়ার পথে সে অত বড় কাণ্ডটা করে। পথে বার না হলে কি আর চোর-ডাকাতের সন্ধান পাওয়া যায়? অত বড় সুযোগটা বোধহয় এবার নষ্ট হয়।

হঠাৎ হেবোর মা একদিন বললেন—‘তোদের তো ছুটিই আছে, আমাকে একবার পলাশপুরে নিয়ে চল না। অনেকদিন জ্যাঠামশাইকে দেখিনি—শুনছি তাঁর খুব অসুখ। তোরা দুই ভাই পারবি নিয়ে যেতে?’

হেবো তো একপায়ে খাড়া। মায়ের জ্যাঠামশাই অর্থাৎ দাদুকে খুব ছেলেবেলায় একবার দেখেছিল ওরা। পলাশপুরের সবচেয়ে নামকরা ডাক্তার তিনি। অনেক গল্প শোনা আছে দাদুর নামে। এবার স্বচক্ষে দেখা যাবে। বাদ সাধল মেজদা, বললে—‘দেখ মা, নিয়ে আমি তোমাকে যেতে পারি, কিন্তু হেবোকে সামলানো আমার কর্ম নয়! কখন ওর মাথায় পোকা নড়বে আর ও গোয়েন্দাগিরি শুরু করবে! সূতরাং হয় হেবো তোমার সঙ্গে যাক, আমি থাকি অথবা আমি যাই হেবো থাকুক।’

মা হেসে বললেন—‘না, হেবোকে আমিই সামলাবো। তোকে ভাবতে হবে না।’

অগত্যা হেবো, তার মা আর মেজদা একদিন এসে হাজির হলেন পলাশপুরে। রায়সাহেব নিবারণ মৌলিক পলাশপুর শহরেই শুধু নয় সারা অঞ্চলটার মধ্যে সবচেয়ে পশারওয়ালা ডাক্তার। বয়স ষাটের কোঠায়, সন্তর ছুই-ছুই। তবু এখনও অক্লান্ত পরিশ্রম করতে পারেন। মস্ত বাড়ি, গাড়ি, বাজারের ওপর ডিসপেন্সারি। রায়সাহেব নিজে নিঃসন্তান। তাঁর দূর সম্পর্কের এক ভাগ্নে ছাড়া অত বড় বাড়িটায় আর যারা থাকে তারা চাকর ডাইভার অথবা দরোয়ান শ্রেণীর। রায়সাহেবের বিপুল সম্পত্তির উত্তরাধিকারী এই ভাগ্নেটির দুর্ব্যবহারে নাকি আত্মীয়-স্বজনেরা সবাই একে-একে তাঁকে ত্যাগ করেছে। হেবোর মাও এজন্য আসতেন না তাঁর জ্যাঠার কাছে, তবে আজ নাকি তিনি মরণাপন্ন অসুস্থ, তাই এসেছেন।

দাদুর বাড়িতে পৌঁছেই হেবোর মনে হল, আবহাওয়াটা কেমন যেন ভারি-ভারি। দাদু কারো সঙ্গে ভাল করে কথাই বলেন না। গুম হয়ে পড়ে আছেন নিজের শোবার ঘরে। ওদের খাওয়া-থাকার যাবতীয় ব্যবস্থা করল পুরনো দিনের চাকর—নটবর।

ভাগ্নেপ্রবর লুটুবাবু সারা জীবনে কাজ-কর্ম চাকরি-বাকরি কিছুই করেননি। প্রয়োজন হয়নি। ছেলেবেলা থেকে মামার অন্নধ্বংস করা ছাড়া দ্বিতীয় কোনো কাজ ছিল না তাঁর। তাই তিনি শখের আর্টিস্ট হতে চেয়েছিলেন। ছবি আঁকা, মডেল গড়া—এইসব নিয়েই তাঁর সময় কাটে। বাড়ির একতলায় তাঁর বিরাট সাম্রাজ্য। তার নাম ‘স্টুডিও’। সেখানে রাখা আছে তাঁর ছবি আর মাটির মূর্তি। সেখানে তিনি কাউকে ঢুকতে দেন না। ভাগ্নেপ্রবরের ঐ ঝাঁকি-দর্শনের মধ্যেই হেবো চিনে ফেলেছে লোকটাকে। এমন কাঁচা-পাকা বেড়াল-গোঁফ কখনো কোনো আর্টিস্টের হয়? তাই কি ওঁর স্টুডিও সর্বদা তালাবদ্ধ?

হেবোর মা একবার তাঁকে আড়ালে ডেকে অসুখের কথাটা জিজ্ঞাসা করলেন; কিন্তু ভাগ্নেপ্রবর কিছুই ভাঙলেন না। বোঝা গেল এঁদের আগমনে লুটুবাবু খুশি হতে পারেননি। অসুখের কথা জানাবার জন্য মা যখন বেশি পীড়াপীড়ি শুরু করলেন, তখন উনি শুধু বললেন—‘টাকার গরম দিদি। বেশি টাকা থাকলে অমন শখের অসুখ অনেকেরই হয়!’

এরপর আর কথা চলে না। হেবোর মা ওদের দু-ভাইকে ডেকে বললেন—‘দেখ, আমার সন্দেহ হচ্ছে তোদের দাদুর ঠিকমত চিকিৎসাই হচ্ছে না। তোদের উচিত, যে ডাক্তারবাবু চিকিৎসা করছেন তাঁর কাছ থেকে ব্যাপারটা জেনে নেওয়া। দরকার হলে তোদের বাবা অথবা মেসোকে টেলিগ্রাফ করে আনতে হবে। সত্যি কথা বলতে কি, লুটুকে আমার ঠিক যেন বিশ্বাস হচ্ছে না।’

হঠাৎ পাশের ঘর থেকে পরদা সরিয়ে নটবর হুড়মুড় করে এসে পড়ে মায়ের পায়ের ওপর। বলে—‘আপনি ঠিকই ধরেছেন মা! বুড়ো কর্তা এক্ষেত্রে বিন-চিকিচ্ছেয় মারা যাচ্ছেন!’

এইবার একটা সূত্র পাওয়া গেল। নটবরের কাছ থেকে অসুখের একটা আদ্যোপান্ত ইতিহাস সংগ্রহ করা শক্ত হ'ল না। মাসখানেক আগে এক রাতে রায়সাহেব নাকি ভয় পেয়ে অজ্ঞান হয়ে যান। এ ঘটনা ঘটে তাঁরই ডিসপেন্সারি-ঘরে। তাঁকে ধরাধরি করে বাড়িতে আনা হয়। পরদিনই তাঁর প্রবল জ্বর আসে। আর এরপর থেকেই রায়সাহেব একেবারে বদলে গিয়েছেন। সর্বদাই ভয়ে ভয়ে থাকেন। কাছে লোক না থাকলে আঁতকে ওঠেন। শোবার ঘর ছেড়ে একেবারেই বার হন না। ওঁর বাইরের ঘরটা তালাবন্ধ করে ফেলে রেখেছেন তারপর থেকে। কাউকে ঢুকতে দেন না সে ঘরে। কেন, তা কেউ জানে না।

মেজদা বলে—‘এ রকম হঠাৎ ভয় পাবার কারণটা কী?’

—‘আজ্ঞে বুড়ো কর্তার দার্জিলিঙে একটা বাড়ি আছে। গরমকালটা তিনি প্রতি বছর সেখানে কাটিয়ে আসেন। সেবার সেখান থেকে তিনি নিয়ে এলেন একটা নেপালী দরওয়ান। মোহন থাপা। আমরা তাকে বলতাম বাহাদুর। সে থাকত ঐ পশ্চিমের ঘরটায়। একদিন কী হল—মোহন থাপা গলায় দড়ি দিয়ে মরল। তারপর থেকেই বাড়িতে নানান উৎপাত শুরু হল। দরজা-জানলা ইচ্ছেমতো খোলে, ইচ্ছেমতো বন্ধ হয়। মাঝরাতে টিনের চালায় কারা যেন হেঁটে বেড়ায়। বুড়ো কর্তা দার্জিলিঙ থেকে ওর ছোট ভাইকে আনালেন। তার নাম কিশোর থাপা। বললে বিশ্বাস করবেন না, সে দেখতে ছব্ব ওর দাদার মতো। লোকটা যেদিন এল বুড়োকর্তাই তাকে প্রথম দেখে আঁতকে উঠেছিলেন। পরে জানা গেল লোকটা বাহাদুরের প্রেতাশ্রা নয়, যমজ ভাই। কিন্তু বুড়োকর্তা তাকে সহ্য করতে পারলেন না। রাত-বিরেতে হঠাৎ তাকে দেখলেই উনি চমকে উঠতেন। মনে পড়ে যেত তার দাদাকে। শেষে তিন মাসের মাইনে দিয়ে তাকে তিনি দার্জিলিঙের বাড়িতেই পাঠিয়ে দিলেন। এদিকে তেনাদের অত্যাচার চলতেই লাগল। কত শাস্তি-সন্তোষন করা হল। ডাক্তার মৈত্রই ব্যবস্থা করেছিলেন এসবের...’

—‘ডাক্তার মৈত্রটা কে?’ জিজ্ঞাসা করল হেবো।

—‘বুড়োকর্তাকে যিনি চিকিৎসা করেন আর কি। বিলেত-ফেরত আর জোয়ান বয়স হলে কী হবে, বামুনের ছেলে তো? গলায় পৈতেও আছে, ঠাকুর দেবতাকে ভক্তিও করেন। তিনিই পরামর্শ দিলেন ‘শাস্তি-সন্তোষনের। মায় গয়ায় পিণ্ডি পর্যন্ত দিয়ে আসা হল—কিন্তু তেনাদের দাপাদপিটা কিছুতেই বন্ধ হল না।’

মেজদা প্রশ্ন করে—‘কিন্তু বাইরের ঘরে কী আছে তাহলে?’

নটবর কী একটা জবাব দিতে যাচ্ছিল, হঠাৎ দরজার দিকে তাকিয়ে ঢোক গিলে চূপ করে গেল। ঘরে এলেন লুটুবাবু। এসেই ধমকে দিলেন নটবরকে—‘কী রে বেটা! এদের ভূতের গল্প শুনিয়ে ভয় দেখাচ্ছিস তো? চাপ্কে পিঠের ছাল তুলে দেব!’

হেবোর মা বলেন—‘নটবরের দোষ নেই, আমরাই ওকে জিজ্ঞাসা করছিলাম।’

লুটুবাবুর জায়গাল কুণ্ঠিত হয়ে উঠল। বলেন—‘তোমাদেরই বা ওসব কথায় থাকার দরকার কী? জ্যাঠাকে দেখতেই তো এসেছ দিদি, ভূত দেখতে তো আসনি!’

হেবো বুঝতে পারে ভেতরে ভেতরে একটা গভীর ষড়যন্ত্র চলছে। এক্ষেত্রে দাদুকে রক্ষা না করলে তার অধর্ম হবে। ওসব ভূত-চূত সে মানে না। এসব আসলে কারও শয়তানি। কার হতে পারে? লুটুমামা, নটবর, কিশোর থাপা? বাড়িতে আর কে কে থাকে? কাউকে কিছু না বলে সে সুটকেস খুলে একে-একে তার সাজ-সরঞ্জামগুলো বার করে। মাপবার ফিতে, ম্যাগনিফাইং গ্লাস, নোটবই, পেনসিল—

মেজদার মুখে খেলে গেল একচিলতে হাসি, বললে—‘শার্লক হেবোর নাক-সুঁড়সুঁড়ানি শুরু হয়েছে!’

হেবো জবাব দিল না।

*

*

*

সন্ধ্যাবেলা ডাক্তার মৈত্র পরীক্ষা করতে এলেন দাদুকে। হেবো তখন স্পষ্টই তাঁকে জিজ্ঞাসা করে দাদুর অসুখটা কী? লুটুবাবু ধমক দিয়ে ওঠেন—‘তাতে তোমার কী দরকার হে ছোকরা?’

ডাক্তার মৈত্র তাঁকে খামিয়ে দিয়ে বলেন—‘আহা হা, রাগ করছেন কেন? ছেলোটো তো নেহাত ছোটো নয়, এবার স্কুল-ফাইনাল দেবে। ওদেরও কিছু-কিছু জানা দরকার।’ তারপর হেবোর দিকে ফিরে বলেন —‘তোমার দাদু একটা মানসিক অসুখে ভুগছেন। হঠাৎ ভয় পেয়ে গিয়েছেন আর কি।’

হেবো আর কথা বাড়ায় না। সে বুঝতে পারে আসল ক্লু লুকোনো আছে ঐ তালাবন্ধ ঘরে। ও-ঘরে দাদু কাউকে ঢুকতে দিচ্ছেন না কেন? ঐ ঘরটা সবার আগে ভাল করে সার্চ করে দেখা দরকার। কাজটা খুবই কঠিন। দাদু কড়া হুকুম দিয়ে রেখেছেন—ও-ঘরে কেউ যাবে না। তালাবন্ধ ঘরের চাবিটা থাকে দাদুর বালিশের নিচে।

কিন্তু উদ্যোগী পুরুষ-সিংহকে অত সহজে হতাশ হতে নেই। হেবো রাত্রে খাওয়া-দাওয়ার পর বসল দাদুকে সেবা করতে। মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে থাকে। হেবোর মা একবার উঁকি দিয়ে দেখে গেলেন। খুশি হলেন—হেবো যে তার পাগলামি ছেড়ে দাদুর সেবায় মন দিয়েছে এতে মনে মনে উৎফুল্ল হলেন তিনি। ক্রমে ঘুমিয়ে পড়লেন দাদু। হেবোও উঠে যায়। বলা বাহুল্য ঐ ফাঁকে দাদুর বালিশের তলা থেকে একটি চাবি চলে আসে হেবোর পকেটে।

মধ্যরাত্রে সবাই যখন অঘোর ঘুমে অচেতন তখন হেবো চুপিসারে উঠে পড়ে বিছানা ছেড়ে। পা টিপে টিপে চলে আসে বাইরের ঘরে। তালা খুলে ঘরে ঢোকে। দীর্ঘদিন বন্ধ থাকায় কেমন যেন একটা ভ্যাপসা গন্ধ বার হচ্ছে ঘরটা থেকে। হেবো আলো জ্বালল না। একটা টর্চের আলোয় ঘরখানা ভাল করে দেখল। ঘরটা মামুলিভাবে সাজানো। চেয়ার-টেবিল-আলমারি-সোফা। দেওয়াল-ঘড়িটা বন্ধ হয়ে আছে সওয়া সাতটা বেজে। ক্যালেন্ডারের পাতা ছেঁড়া হয়নি এ মাসে। গতমাসের পৃষ্ঠাটা প্রমাণ দিচ্ছে ঘরটা মাসাধিককাল অব্যবহৃত পড়ে আছে। সব আসবাবপত্র, মায় মেঝেতে, ধুলোর একটা আস্তরণ পড়ে গিয়েছে। হেবো লক্ষ করে দেখে দাদুর সেক্রেটারিয়েট টেবিলের দেওয়ালগুলা তালাবন্ধ। টেবিলের ওপর কলমদানি, কাগজ-চাপা, কিছু ফাইলপত্র, একটা পিনকুশন, টেলিফোন ডাইরেক্টরি, আর টেলিফোনটা নামানো আছে সেই ডাইরেক্টরির ওপর। কাছে গিয়ে ভাল করে লক্ষ্য করে দেখে, টেলিফোনের মাউথ-পিসের ওপর মাকড়সার জাল হয়েছে। অর্থাৎ অনেকদিন ধরেই ওটা ঐভাবে পড়ে আছে। নিশ্চয়ই দাদু শেষবার যখন এ ঘর তালাবন্ধ করে যান মাসাধিককাল আগে তখন টেলিফোনটাকে ক্র্যাডল-এর ওপর রেখে যেতে ভুলে গিয়েছেন। হেবো মনে করে দেখে, ওরা আসার পর বাড়িতে টেলিফোন একবারও বাজেনি। বাজবে কোথা থেকে? আজ এক মাসের ওপর ওদের টেলিফোন সবসময় এনগেজড!

হেবো পকেট থেকে রুমাল বার করে হাতে জড়িয়ে নিয়ে আলগোছে টেলিফোনটা তুলে যথাস্থানে বসিয়ে দেয়। উল্লেখযোগ্য আর কিছুই পাওয়া গেল না ঘরে। ভূতের নামগন্ধও নেই। ঘর তালাবন্ধ করে চাবিটা আবার হেবো রেখে দেয় দাদুর বালিশের তলায়। সারারাত বেচারির ঘুম হল না। কী হতে পারে? কেন এমন অহেতুক ভয় পেলেন দাদু? কে ভয় দেখালো? কী ভয় দেখালো, আর কেনই বা দেখালো?

হঠাৎ ভোর রাতে হেবোর ঘুম ভেঙে গেল। ও কীসের শব্দ? ঘুমের জড়িমা কেটে যেতেই হেবো বুঝতে পারে পাশের তালাবন্ধ ঘরে টেলিফোন বাজছে। হাতঘড়িটা তুলে নিয়ে দেখলে, রাত তখন সাড়ে তিনটে। এত রাত্রে কে টেলিফোন করছে? ঘরের দরজা খুলে বেরিয়ে এসে দেখে তালাবন্ধ ঘরের কপাট খোলা। ভেতরে আলো জ্বলছে। দ্রুতপায়ে এগিয়ে আসে হেবো। দেখে দাদু ইতিমধ্যেই এসে তালা খুলে ঘরে ঢুকেছেন। দরজার ফাঁক দিয়ে হেবো লুকিয়ে দেখতে থাকে।

দেখে, টেবিলের পাশে দাঁড়িয়ে দাদু টেলিফোন কথা বলছেন :

—‘কে তুমি? তুমিও রায়সাহেব? লায়ার! না তুমি রায়সাহেব নও! আমাকে মিথ্যে ভয় দেখাচ্ছ কেন! বল তুমি কে? ...অ্যাঁ! কে?...তুমি?তোম?...কায়সে তোম?’

হাত থেকে পড়ে গেল টেলিফোনটা। রায়সাহেব নিবারণ মৌলিক সংজ্ঞা হারিয়ে লুটিয়ে পড়লেন মাটিতে। হেবো চিৎকার করে ওঠে। লোকজন ছুটে আসে। মা, লুটুমামা, নটবর। ধরাধরি করে ওঁকে সবাই নিয়ে গেল তাঁর ঘরে। কিছুদিন হল একটু সুস্থ হয়ে উঠছিলেন তিনি, আবার জ্বর এল পরদিন সকালে।

সকালবেলা শহরের সব কজন বড় ডাক্তারই দল বেঁধে দেখতে এলেন রায়সাহেবকে। অন্যান্য জুনিয়ার ডাক্তাররা নিবারণচন্দ্রকে আন্তরিক শ্রদ্ধা করতেন। অনেকেই খবর নিতে আসতেন সকাল-সন্ধ্যায়। ডাক্তার মৈত্র সকলের সঙ্গে পরামর্শ করে চিকিৎসা করছিলেন। ডাক্তার মৈত্র অবশ্য সবে ডাক্তারিতে ঢুকেছেন। অল্প বয়স। পলাশপুরে এসে নিবারণচন্দ্রের জুনিয়ার হিসাবে ঐ ডিস্‌পেন্সারিতেই বসছিলেন। দাদুর অত বড় প্র্যাকটিসের ঠেলা সামলাতে ভদ্রলোক একেবারে প্রাণান্ত হয়ে পড়েছেন। দেহাত থেকে দলেদলে রুগী আসে সকালবেলা এখনো ওঁর চেষ্টা করে। তাদের ওষুধ দিয়ে বিদায় করে—দাদুর পুরাতন কেসগুলি তাদের বাড়ি গিয়ে দেখে, তারপর বেলা দুটোই হোক তিনটেই হোক তিনি নিবারণবাবুকে দেখতে আসেন। দাদুকে পরীক্ষা করে ওষুধ-পথ্যের ব্যবস্থা শেষ করে তবে বাড়ি যান, স্নানাহার করেন। দাদু খুবই স্নেহ করেন এই জুনিয়ার ডাক্তারটিকে, আর তিনিও দাদুকে বাপের মতো শ্রদ্ধা করেন। মাঝে মাঝে যেদিন ডাক্তার মৈত্রের বেশি বেলা হয়ে যায় সেদিন দাদু ওঁকে ধমক দেন—‘এত বেলা হয়ে গিয়েছে, এখনও তোমার স্নানাহার হয়নি? ও বেলায় এলেই পারতে!’

ডাক্তার মৈত্র জবাব দিতেন না। চুপচাপ পরীক্ষা করে প্রেসক্রিপশন লিখতেন তিনি।

তবু কী জানি কেন হেবোর মা একটা অস্বাভাবিক বোধ করছিলেন। মেজদার সঙ্গে আড়ালে তিনি কী সব পরামর্শ করলেন। হেবো আন্দাজ করলে সবই, কিন্তু ওঁরা যখন তাকে পরামর্শ করতে ডাকলেন না তখন সেও ওপরপড়া হয়ে গেল না কথা বলতে। বেশ তো, ওঁরা যা ভাল বোঝেন করুন, হেবোও যা ভাল বুঝবে করবে।

পরদিনই অজিতেন্দ্রবাবু, মানে হেবোর মেসোমশাই, এলেন মরণাপন্ন জ্যেষ্ঠশ্বশুরকে দেখতে। বোঝা গেল নিভৃত কক্ষে মা-মেজদার আলাপটা কী-জাতের হয়েছিল। অজিতেন্দ্রবাবু পুলিশের দারোগা, এসেছেন কিন্তু ধুতি-পাঞ্জাবি পরে। তাঁকে দেখে লুটুবাবুর মুখখানি কালো হয়ে গেল, বললেন—‘এ কী, আপনি?’

—‘হ্যাঁ, এলাম। ওঁকে দেখতে।’

—‘এত দেখার কী আছে তাও তো বুঝি না। মামা মিস্ ইন্ডিয়াও না, তাজমহলও না! তবু এত লোকে দেখতে আসে কেন, কে জানে!’—বলেই বেরিয়ে যান তিনি।

অজিতেন্দ্রবাবুকে হেবোর মা আড়ালে ডেকে সমস্ত কথা বললেন। মেজদাও ছিল সে গোপন পরামর্শ-সভায়। হেবো ঘরে ঢুকতেই হেবোর মা বললেন—‘আমরা একটু জরুরি কথা বলছি হেবো, তুমি বরং একটু পরে এস।’

চোখ ফেটে জল বেরিয়ে আসে হেবোর। বেশ মজা! এ সমস্যার সমাধান যার পক্ষে করার সম্ভাবনা সবচেয়ে বেশি তাকেই ওঁরা আমল দিতে চাইছেন না। কেন? সে বয়সে ছোট বলে? সে মেজদার মতো কলেজে ক্লাস করতে যায় না বলে? কিন্তু বয়সে ধেড়ে হয়েছে ও যে বুদ্ধিতে বেঁড়ে হবে না তারই বা নিশ্চয়তা কী? সেবার কাশী যাওয়ার পথে আবগারি পুলিশের বড়কর্তা সেই মুখার্জিসাহেবকে ধমক দিয়ে বলেছিলেন—আমার ইচ্ছে করছে তোমাকে ঐ ছোট ছেলের কাছ হই মাসের জন্য শিক্ষানবিশিতে পাঠাই! তা সেই মুখার্জিসাহেবের বয়স কি হেবোর চেয়ে কম ছিল? বেশ, থাক, দরকার নেই! যা করার একাই করবে হেবো। কারও সাহায্য বা পরামর্শের প্রয়োজন নেই!

বাগানে নেমে যায় সে। পেয়ারাগাছ থেকে একটা ডাঁশামতন পেয়ারা পেড়ে ডালে পা বুলিয়ে জুত করে চিবোতে বসে। নিচু গলায় গান ধরে—‘ও তোর আপনজনে ছাড়বে তোরে, তা বলে ভাবনা করা চলবে না।’

*

*

*

পরদিন ডাক্তার মৈত্র যখন রায়সাহেবকে দেখতে এলেন, তখন হেবো, মেজদা আর অজিতেন্দ্রবাবু বসেছিলেন সেখানে। অজিতেন্দ্রবাবু ডাক্তার মৈত্রের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হবার চেষ্টা করেন, বলেন—‘ডাক্তার মৈত্র, আপনি ডাক্তারি ব্যাগ ব্যবহার করেন না কেন? এ রকম একটা ব্যাগ নিয়ে এসেছেন?’

ডাক্তার মৈত্রের হাতে ছিল একটা ক্যানভাসের ব্যাগ। পি-এ-এ মার্কা। অর্থাৎ প্যান-অ্যামেরিকান এয়ারওয়েজের এয়ার-ব্যাগ। সচরাচর ডাক্তারদের যেমন কালো ডাক্তারি ব্যাগ হয়, তা নয়।

ডাক্তারবাবু বলেন—‘এটাতে আমার হাত ধোবার তোয়ালে সাবান ইত্যাদি থাকে। ডাক্তারি-ব্যাগ আমার গাড়িতেই আছে।’

বলতে বলতেই নিবারণবাবুর গাড়ির ড্রাইভার হাজিরা সিং ঘরে এল। তার হাতে কালো একটা চামড়ার ডাক্তারি ব্যাগ। ডাক্তার মৈত্র সেই ব্যাগ থেকে একটা ইঞ্জেকশনের সিরিঞ্জ আর শিশি বার করে নেন। রায়সাহেবকে ফুঁড়তে ফুঁড়তে বলেন—‘বিলেত থেকে ফেরার সময় আর জাহাজে আসিনি, প্লেনে এসেছিলাম। ঐ ব্যাগটা তখন থেকেই আমার সঙ্গে আছে।’

হেবো ফস করে প্রশ্ন করে বসে—‘আপনি বিলেত গিয়েছিলেন বুঝি?’

রায়সাহেব জবাব দেন—‘মৈত্র এম. আর. সি. পি.। উফ্! ইন্ট্রাভেনাস দিলে নাকি?’

‘না ইন্ট্রাভেনাস নয়।’—বলেন ডাক্তার মৈত্র, দাদুর বাহুমূলটা উলতে উলতে।

হেবো আরও কিছু জিজ্ঞাসা করতে যাচ্ছিল, হঠাৎ ধমক দিলেন লুটুবাবু—‘তোমরা রুগীর ঘরে কেন?’

অজিতেন্দ্রবাবুর ইঙ্গিতে হেবো বেরিয়ে আসে। আর কিছু কথোপকথন সে শুনতে পায় না। না পাক ক্ষতি নেই; শিকারী বিড়ালটিকে সে চিনতে শুরু করেছে ঠিকই। আপনমনে বাগানে পায়চারি করতে করতে হেবো গুনগুন করে সুর ভাঁজে, ‘যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে, তবে একলা চল রে।’

গেটের বাইরে দাঁড়িয়ে আছে পুরনো মডেলের কালো শেভলেখানা। দাদুর অনেকদিনের গাড়ি। হেবো পায়ে পায়ে গেটের বাইরে বেরিয়ে এল। ড্রাইভারের সঙ্গে ভাব জমাতে চায় হেবো—‘ড্রাইভারদাদা, আমাদের শহরটা একদিন দেখিয়ে আনলে না তো তুমি?’

হাজিরা সিং বলে—‘কেয়া কিয়া যায় বোলিয়ে ছোটাসাব। মেরা তো মরশেকা ভি ফুরসৎ নেহি।’

তা বটে। হাজিরা সেই সাত-সকালে গাড়ি বার করে হাজিরা দেয়; আর সারাদিন তাকে টো-টো করে ঘুরতে হয়। অনেকদিনের পুরনো গাড়ি। আজ এটা কাল সেটা খুটখাট মেরামতি লেগেই আছে, তবু এতদিন শুধু বাড়ি থেকে চেষ্টার আর চেষ্টার থেকে বাড়ি যাতায়াত করতে হত। বয়স হয়ে যাওয়ায় দাদু আজকাল আর দেহাতে কলে যেতেন না। যেটুকু রুগী দেখতেন তা ঐ চেষ্টারে বসেই। বড়জোর শহরে দু-একটা পুরনো ঘরে রুগী দেখতে যেতেন। এখন তিনি অসুস্থ হয়ে পড়ায় ডাক্তার মৈত্রকে ঠেকাতে হচ্ছে সেই রুগীর ঝামেলা। ড্রাইভারকেও ঘুরতে হচ্ছে সারাদিন। ডাক্তার মৈত্র তো আর বয়সের দোহাই দিতে পারেন না। ডাকলে রুগীর বাসায় গিয়েও দেখে আসতে হয়। ফলে বেচারি হাজিরা সিং-এর আর মরবার ফুরসত নেই।

হেবো প্রশ্ন করে একে-একে। হাজিরা সিং কতদিন কাজ করেছে, চেষ্টারে দাদুর কতজন কর্মচারী আছে, কে কেমন লোক। হাজিরা সিং তার ভাঙা-ভাঙা হিন্দিতে সব কথা বলে যায়। হাজিরা সিং পুরনো লোক। মোহন থাপার আগেই কাজে বহাল হয়েছে সে। তবে, নটবর তার থেকেও আগে এসেছে এ বাড়ি। কিশোর থাপা? সে তো এসেছে সবে। মোহন থাপা আত্মহত্যা করার পরে। দাদুর চেষ্টারে আছেন জনাছয়েক কর্মচারী। তাদের মধ্যে ভবেশ গাঙ্গুলীই পুরনো লোক। পাশ-করা কম্পাউন্ডার। হীরেন আর গোরাবাবুও পাশ-করা কম্পাউন্ডার। ক্যাশ থাকে ভবেশবাবুর কাছে। আগে দাদু তাঁর কাছ থেকে দৈনিক ক্যাশ বুঝে নিতেন। এখন ডাক্তার মৈত্র সেটা বুঝে নেন। ডিসপেন্সারির যাবতীয় ঝামেলা একা মৈত্রকেই সামলাতে হয়। মৈত্র এসেছেন বছরখানেক আগে। বেশ সজ্জন, সকলের সঙ্গেই ভালো ব্যবহার করেন। গোরাবাবু লোকটিকে হাজিরা সিং বরদাস্ত করতে পারে না। কেমন যেন চোর-চোর ভাব লোকটার। লুটুবাবু খুব বিশ্বাস করেন তাকে। হাজিরা সিং দেখেছে প্রায়ই গোরাবাবু এসে লুটুবাবুকে কী সব গুজুর-গুজুর করে বলে যায়।

রাত্রে অজিতেন্দ্রবাবু হেবোর মাকে বললেন—‘ডাক্তার মৈত্রের কাছে সব কথা শুনলাম। আমার মনে হয় আপনারা ভুল আশঙ্কা করছেন। ভূতের ভয় হচ্ছে করে কেউ ওঁকে দেখাচ্ছে না। কারই বা স্বার্থ হবে এভাবে ভূতের ভয় দেখাবার?’

মা কিন্তু যুক্তিটা মেনে নিতে পারেন না, বলেন—‘ভূতের ভয় দেখাবার স্বার্থ হতে পারে তার, যে আশা করছে হঠাৎ হার্টফেল করে মারা গেলে এ সম্পত্তিটা তার হাতে আসবে।’

অজিতবাবু বলেন—‘বেশ তো, আমরা তো আরও কিছুদিন আছি। দেখাই যাক না পরিস্থিতি কোন দিকে গড়ায়।’

মা বলেন—‘কিন্তু ওঁকে আপাতত এখান থেকে সরিয়ে কলকাতা নিয়ে গেলে হয় না? এ বাড়িতে উনি আবার ভয় পেতে পারেন।’

—‘সে কথাও বলেছিলাম। কিন্তু লুটুবাবু রাজি নয়।’

—‘সে কেন রাজি নয়?’

—‘বলছে এক হাতেই চিকিৎসা হওয়া ভাল।’

হেবো সব কথা শুনল চুপিসারে।

*

*

*

অনেক রাত্রে হেবোর ঘুম ভেঙে গেল। দাদুর ঘরে কারা যেন ফিসফিস করে কথা বলছে। কান খাড়া করে খানিকটা শুনল হেবো। হ্যাঁ, ঠিকই। কথা বলছে কেউ। পা টিপে টিপে এ-ঘরের কাছে এসে উঁকি দিতেই হেবো দেখতে পেল—দাদু আর ওর মেসোমশাই অজিতেন্দ্রবাবু বসে কথা বলছেন। দাদু বলছিলেন—‘বুঝলে অজিত, সেদিন থেকেই আমার মনে হল মোহন থাপার অতৃপ্ত আত্মাটা এ বাড়ির আনাচেকানাচে ঘুরে বেড়াচ্ছে। শুধু আমি নই, হাজিরা সিং, নটবর—ওরাও বললে যে অপদেবতার অস্তিত্ব ওরাও টের পেয়েছে। মৈত্র বললে একটা শাস্তি-স্বস্ত্যয়নের ব্যবস্থা করতে। পূজা-অর্চনা সবই করা হল, কিন্তু অতৃপ্ত প্রেতাত্মার তৃপ্তি হল না। এই সময়, বুঝলে অজিত, একদিন এমন একটা অদ্ভুত কাণ্ড ঘটল...’

ঘটনাটা আদ্যস্ত শুনে হেবোর মাথার চুলগুলো খাড়া হয়ে ওঠে। রায়সাহেব সন্ধ্যাবেলা ডিসপেন্সারিতে গিয়েছেন। সেদিন সকাল থেকেই ওঁর শরীরটা খারাপ। আকাশের অবস্থাও খারাপ। টিপি-টিপি বৃষ্টি নেমেছে। রুগীদের বিদায় করে সন্ধ্যা রাতেই বাড়ি ফিরে আসবেন স্থির করলেন। চেম্বারে ডাক্তার মৈত্র ছিলেন না। হীরেন, গোরা আর ভবেশবাবু ছিলেন। রায়সাহেব ডিসপেন্সারিতে ওঁর টেলিফোনটা তুলে নিলেন, ইচ্ছা, বাড়িতে ফোন করে গাড়িটা পাঠিয়ে দিতে বলবেন। ফোন তুলে অপেক্ষা করতেই অপারেটর বলল—‘ইয়েস?’

—‘নাম্বার থার্টিন প্লিজ।’

ওঁর বাড়ির নাম্বার তের, আর চেম্বারের নাম্বার চৌদ্দ।

প্রথমে রিঙিং টেনে, এবং তার পরেই শুনলেন—‘হ্যালো।’

—‘নাম্বার থার্টিন? রায়সাহেবের বাড়ি?’—প্রশ্ন করলেন রায়সাহেব।

—‘জী হ্যাঁ, বোলিয়ে।’

একটু ঘাবড়ে গেলেন রায়সাহেব। বাড়িতে আছেন লুটুবাবু আর নটবর, হিন্দিতে তারা কথা বলবে কেন? তাই একটু অবাক হয়ে বলেন—‘তুমি কে কথা বলছ?’

—‘আপ কৌন?’

—‘আরে আমি রায়সাহেব। তুমি কে? লুটু অথবা নটবরকে ডেকে দাও—’

—‘সালাম বড়াসাব, ম্যায় বাহাদুর।’

রায়সাহেবের হাত থেকে টেলিফোনটা পড়ে যায়। তখনও কিশোর থাপা কাজে লাগেনি। বাহাদুর বলতে তখন সকলে মোহন থাপাকেই বুঝত। আর সেই বাহাদুর তার দিন-দশেক আগে আত্মহত্যা করেছে।

তাকে ঈর্ষাবে বসে পড়তে দেখে ভবেশবাবু ছুটে এসে বলেন—‘কী হয়েছে স্যার?’

—‘কিছু না। তুমি একটা রিক্শা ডেকে দাও।’

রিক্শা করে বাড়ি ফিরে এসে রায়সাহেব দেখেন, লুটুবাবু বাড়ি নেই। নটবর বললে ইতিমধ্যে তাঁর বসার ঘরে কেউ ঢোকেনি। সে অবশ্য রান্নাঘরে ছিল। টেলিফোন বেজেছিল কিনা, তা সে জানে না। অবাক কাণ্ড! কাউকে কিছু না বলে নিজের ঘরে গিয়ে আলো নিবিয়ে শুয়ে পড়লেন। তিনি কি ভুল শুনছেন? অতগুলো কথা। অনেকক্ষণ এপাশ-ওপাশ করেছে ঘুম এল না। হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে

আসছে। বৃষ্টিটাও বেঁপে এসেছে। লক্ষণ ভাল নয়। রায়সাহেবের মনে হল একটু মেডিকেটেড ব্র্যান্ডি খেতে পারলে ভাল হত। মদ উনি খান না। ঘরে ব্র্যান্ডি নেই। কিন্তু ডাক্তারখানায় আছে। দেওয়াল-ঘড়িতে দেখেন, রাত দশটা। এখনও কি ডিস্পেন্সারি খোলা আছে? দেখাই যাক না। তাই শোবার ঘর থেকে বসার ঘরে এসে ফোনটা তুলে নিলেন—উদ্দেশ্য, ডিস্পেন্সারি খোলা থাকলে একটা ওষুধ এনে খাবেন। ফোনটা তুলে নিয়ে নাম্বার চাইলেন। ও-প্রান্ত থেকে ভারি গলায় শোনা গেল—‘হ্যালো!’

—‘এটা কি নাম্বার ফোর্টিন? রায়সাহেবের ডিস্পেন্সারি?’

—‘ইয়েস, স্পিকিং।’

—‘তুমি কে কথা বলছ?’ প্রশ্ন করেন রায়সাহেব।

—‘তুমি কে কথা বলছ?’ প্রতিধ্বনি করে যেন ও লোকটা।

—‘কে মৈত্র নাকি?’

—‘আঃ! বললাম তো এটা রায়সাহেবের ডিস্পেন্সারি। আমি রায়সাহেব কথা বলছি। তুমি কে? কী চাও?’

রায়সাহেব স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। হকচকিয়ে গিয়ে বলেন—‘রায়সাহেব! কোন রায়সাহেব?’

ও প্রান্তের লোকটা ধমকে ওঠে—‘ঈডিয়ট! পলাশপুরে ক-জন রায়সাহেব আছে? আমি রায়সাহেব নিবারণ মৌলিক কথা বলছি। তুমি কে হে ছোকরা?’

রায়সাহেব কোনো জবাব দিতে পারেন না। ফোন রেখে বসে পড়েন। মিনিটখানেক বোধহয় তাঁর জ্ঞান ছিল না। তারপর বুঝলেন, এসব নিশ্চয়ই কারো শয়তানি। কে হতে পারে? রায়সাহেব নিবারণ মৌলিক একজন অত্যন্ত মানী লোক, তাঁকে ‘ঈডিয়ট’ বলবার সাহস কার আছে? কিন্তু নাঃ, শরীর খারাপ বলে এসব বেয়াদবি বরদাস্ত করে যাওয়া চলে না। পাগলের মতো লাফিয়ে উঠলেন উনি। ওঁর বসবার ঘরের সমস্ত জানলা-দরজা বন্ধ করে ঘরে তালা দিয়ে বেরিয়ে এসে হাঁকলেন—‘ড্রাইভার, গাড়ি নিকালো।’

বড়সাহেবের শরীর খারাপ শুনে গাড়ি গ্যারেজে তুলে রাখা হয়েছিল। আবার বার করা হল। রায়সাহেব সোজা গিয়ে উঠলেন ডিস্পেন্সারিতে। ব্যাপারটার একটা হেস্টনেস্ত করে ফেলতে হবে। এখনই। গিয়ে দেখলেন, ডিস্পেন্সারির অন্যান্য কর্মচারীরা চলে গিয়েছে। ডাক্তার মৈত্র শেষ রুগীটিকে বিদায় দিয়ে উঠবার উপক্রম করছেন। রায়সাহেব বলেন—‘তুমি আছ ভালই হয়েছে। আচ্ছা, এর মধ্যে কেউ ফোন করেছিল?’

—‘আজ্ঞে না। আপনার টেলিফোন ছাড়া আর কারো ফোন তো আসেনি।’

—‘আমার ফোন এসেছিল? কে ধরেছিল?’

—‘আজ্ঞে আমি।’

—‘তুমি? তবে তুমি কী সব আজোবাজে কথা বলছিলে?’

ডাক্তার মৈত্র বলেন—‘সে কী স্যার? আমিও তো ঠিক ঐ কথাই বলতে যাচ্ছিলাম আপনাকে। আমি যতবার বলছি—“আমি মৈত্র, কী চাইছেন স্যার?” আপনি ততবারই শুধু বলছেন,—“আমি রায়সাহেবের সঙ্গে কথা বলতে চাই।” আমি আপনার গলার স্বর শুনে বেশ চিনতে পারছিলাম, তাই তখন অবাক হয়ে বললাম—“রায়সাহেব মানে? কোন রায়সাহেব?” তখন আপনি প্রচণ্ড ধমক দিয়ে উঠলেন—“ঈডিয়ট! পলাশপুরে ক-জন রায়সাহেব আছে? আমি ডাক্তার নিবারণ মৌলিকের সঙ্গে কথাবার্তা বলতে চাই।”

রায়সাহেব ক্রমেই দিশাহারা হয়ে যাচ্ছেন। তাহলে তিনি একাই ভুল শোনেননি! কে এমন করছে? কেনই বা করছে? মরিয়া হয়ে শেষ পর্যন্ত টেলিফোনটা তুলে নেন। বাড়ির নাম্বার চাইলেন আবার। নিশ্চিত জানেন, তালাবন্ধ ঘরে কেউ সাড়া দেবে না। রিডিং টোন বেজেই যাবে। সেই রিডিং টোনের আওয়াজটা না শোনা পর্যন্ত ওঁর যেন মুক্তি নেই।

কী আশ্চর্য! একবার বাজতেই ও-প্রান্তের সেই তালাবন্ধ ঘরে টেলিফোন রিসিভারটা কে যেন তুলে নিল। অস্ফুটে কে যেন বললে—‘হ্যালো!’

সে স্বরে মৃত্যুর হিমশীতল একটা স্পর্শ লেগে আছে।

রায়সাহেব শেষ সম্ভাবনাটা একবার হাতড়ে দেখতে চান : ‘আপনার নাম্বার কত?’
ও প্রান্তবাসী ওঁর সেই শেষ অবলম্বনটা ধূলিসাৎ করে বলল—‘তের নাম্বার হজৌর!’
—‘আমি রায়সাহেব বলছি, তুমি...তুমি কে?’
—‘সেলাম বড়াসাব। মায় বাহাদুর হুঁ!’

রায়সাহেব চিৎকার করে ওঠেন—‘বাহাদুর! কৌন্ সা বাহাদুর?’
—‘মোহন থাপা বাহাদুর। হজৌর কা গোলাম, গরিবপরবর!’

রায়সাহেব নাকি আর সহ্য করতে পারেননি। এই উত্তর শুনে অজ্ঞান হয়ে পড়ে যান তিনি। ডাক্তার মৈত্র ওঁকে বাড়ি নিয়ে আসেন। রায়সাহেবের জ্ঞান হয়েছিল পুরো দু-দিন পরে। তার পর থেকেই তিনি অসুখে ভুগছেন।

হেবো সমস্ত বিবরণটা শুনল। অজিতবাবু দাদুকে বললেন—‘আপনি ও ঘরের চাবিটা আমাকে দেবেন একবার?’

—‘না না! ও ঘরে কেউ যাবে না তোমরা! ও ঘরে টেলিফোন আছে!’

*

*

*

দিনতিনেক পরে কলকাতা থেকে হেবোর মেসো অজিতেন্দ্রবাবুর এক বন্ধু এলেন। উনি নাকি লাইফ ইন্সিওরেন্সের অর্গানাইজার। পলাশপুরে এসেছিলেন নিজের কাজে। অজিতেন্দ্রবাবুর সঙ্গে পথে দেখা হয়ে যায়। অজিতেন্দ্রবাবুই তাঁকে ধরে এনেছেন এ বাড়িতে। ভদ্রলোকের নাম প্রবীর মুখার্জি। তাঁকে দেখে লুটুবাবু আরও বিরক্ত হলেন। এ কী, তামাসা দেখতে লোক জুটছে নাকি? কিন্তু অজিতেন্দ্রবাবু কোনো আক্ষেপ করলেন না।

হেবো বাইরের ঘরে ঢুকে দেখে, পাইপমুখো ভদ্রলোকটি বসে ওর মেসোমশাইয়ের সঙ্গে গল্প করছেন। বেশ বুদ্ধিদীপ্ত উজ্জ্বল চেহারা। মাথার চুলগুলি উলটোনো। সুট পরে আছেন তিনি। মেসোমশাই বলেন—‘এঁকে প্রণাম কর হেবো, ইনি হচ্ছেন...’

ভদ্রলোক তাঁকে থামিয়ে দিয়ে বলেন—‘এস খোকা, আমার নাম প্রবীর মুখার্জি, তোমার মেসোমশাইয়ের বন্ধু আমি। এদিকে একটা ইন্সিওরেন্স কেসে এসেছিলাম, শুনলাম তোমরা এখানে আছ, তাই ভাবলাম—’

তাঁকে বাধা দিয়ে হেবো বলে—‘আপনাকে কী বলে ডাকব? ডিটেকটিভ-কাকা?’

ভদ্রলোকের বাক্যস্ফূর্তি হল না। চোয়ালের নিম্নাংশটা ঝুলে পড়ল শুধু। একটু সামলে নিয়ে ঢোক গিলে বলেন—‘সে কী? ও কথা কে বললে? আমি তো ডিটেকটিভ নই! ও রকম অদ্ভুত কল্পনা করলে কেন?’

‘কল্পনা?’ হাসল হেবো, বললে—‘আজ্ঞে না। আমি কল্পনা করে কোনো সিদ্ধান্ত নিই না। আমার সিদ্ধান্ত প্রমাণের ওপর প্রতিষ্ঠিত! আজই একজন গোয়েন্দা এ বাড়িতে আসবেন এটা অনুমান করেছিলাম আমি। মেসোমশাই পুলিশের দারোগা, এসব ক্ষেত্রে ডিটেকটিভের ওপর তিনি সচরাচর নির্ভর করে থাকেন। কিন্তু এটা তো হচ্ছে অনুমান। আপনি ধরা পড়ে গেলেন দুটি কারণে। প্রথমত, মেসোমশাইকে আপনার পরিচয় দেবার সুযোগ না দিয়ে বড় তাড়াহুড়ো করেছেন আপনি। আমার মতো বাচ্চা ছেলের কাছে আপনার এ বাড়িতে আসার কৈফিয়ত দেবার তো প্রয়োজন ছিল না। পরিচয়টা গোপন করার জন্য আপনার মনে যে অপরাধবোধ ছিল তারই তাগিদে একনাগাড়ে আপনি অহেতুক অনেক কথা বলে গিয়েছেন। তাছাড়া আপনি চূড়ান্তভাবে ধরা পড়ে গিয়েছেন আপনার বুকপকেট থেকে উঁচু হয়ে থাকা ঐ ম্যাগনিফাইং গ্লাসে। বীমা কোম্পানির লোকের পক্ষে ওটা বেমানান!’

প্রবীরবাবুর চোখের মণিদুটো টারা হয়ে গেল।

অজিতেন্দ্রবাবু বলেন—‘ওর কাছে লুকিয়ে পার পাবে না প্রবীর! ও একটি ক্ষুদ্রে গোয়েন্দা! ওর কীর্তির কথা তোমাকে পরে বলব আমি। এখন এস, আলোচনা করা যাক!’

হেবোর মতো একটি হাফ-প্যান্টধারীর সঙ্গে রহস্যের আলোচনা করতে হবে শুনে প্রবীরবাবু গুম মেরে গেলেন।

হেবো বললে—‘প্রবীরকাকা, আমার প্রথম পরামর্শ হচ্ছে, আপনি আপনার পরিচয়টা পালটান। বীমা কোম্পানীর দালাল নয়, আপনি নিজেকে পামিস্ট বলে পরিচয় দিন।’

—‘কেন?’

—‘বীমা কোম্পানির দালালের চেয়ে তাতে অনেক সুবিধা। সন্দেহভাজন যে-কজন লোক আছেন,—লুটুমামা, গোরাবাবু, নটবর, ভবেশবাবু এঁদের হাত দেখার অছিলায় নানান প্রশ্ন করতে পারবেন।’

প্রবীরবাবু হেসে বলেন—‘ছেলেমানুষ! তাতে কী লাভ? আসল অপরাধী তো মিথ্যাই বলবে।’

—‘খুব স্বাভাবিক। কিন্তু অনেক উষ্টোপান্টা মিথ্যার ভেতর থেকেই ক্লু পাওয়া যায়। তাছাড়া এ কেসে সবচেয়ে বড় জিনিস হচ্ছে ধুলোভর্তি বাইরের ঘরের ঐ টেলিফোনটা। ভবিষ্যতে হয়ত ফিঙ্গার-প্রিন্ট নিয়ে আমাদের গবেষণা করতে হবে। পামিস্ট, মানে হস্তরেখাবিদের পক্ষে তার ম্যাগ্নিফাইং গ্লাসটার সাহায্যে হাত দেখার অছিলায় আঙুলের ছাপের নকল তুলে নেওয়া সহজ।’

প্রবীরবাবু বুঝতে পারেন, হাফপ্যান্ট পরলেও ছেলেটির মাথাটি পাকা।

অজিতেন্দ্রবাবু আর হেবো ছাড়া প্রবীরবাবুর আসল পরিচয়টা আর কেউ জানতে পারল না, এমনকি হেবোর মা-ও নয়। হেবো মনে মনে খুশি হল। মেসোমশাই তাহলে তাকে ভরসা করতে শুরু করেছেন। অবশ্য এও সে বুঝতে পারে, নিজে-নিজেই প্রবীরবাবুর পরিচয়টা আবিষ্কার করেছিল বলে বাধ্য হয়ে তাকে দলে টেনেছেন মেসোমশাই। সেদিনই প্রবীরকাকু বাইরের ঘরের ডুপ্লিকেট চাবি করালেন। স্থির হল, রাত্রে সবাই ঘুমিয়ে পড়লে ওঁরা তিনজনে ঘরটা পরীক্ষা করে দেখবেন।

সেদিন সন্ধ্যাবেলা ডাক্তার মৈত্র এসে অজিতেন্দ্রবাবু আর প্রবীরবাবুকে নিভৃত ডেকে নিয়ে বললেন—‘কয়েকটা কথা আপনাদের বলতাম। আমার মনে হয় ব্যাপারটা ভাল করে অনুসন্ধান করে দেখা উচিত।’

প্রবীর বলেন—‘কিসের কথা বলছেন আপনি?’

—‘ঐ টেলিফোনে ভূতের গলার বিষয়ে। আমার মনে হয় কেউ হচ্ছে করে ওঁকে ভয় দেখাচ্ছে।’

—‘কিন্তু বুড়ো মানুষকে অহেতুক ভয় দেখিয়ে কার কী লাভ?’

ডাক্তারবাবু একটু ইতস্তত করে বলেন—‘অহেতুক বলে এটাকে ধরে নিচ্ছেন কেন? এই করে হয়ত তাঁর মৃত্যুকে আগিয়ে আনা হচ্ছে। রিভলভারের গুলি অথবা বিষের সাহায্য না নিয়েও তো মানুষ খুন করা যায়।’

অজিতবাবু বলেন—‘তা যায় বৈকি। আমি পুলিশে চাকরি করি। অনেক কিছুই দেখেছি আমি। কিন্তু কার স্বার্থ আছে এ বিষয়ে?’

—‘শুধু স্বার্থ নয়, স্বার্থ ও সুযোগ। “মোটভি” আর “অপারচুনিটি”। কিন্তু সেটা আমার-আপনার পক্ষে বিচার করার চেয়ে কোনোও প্রফেশনাল ডিটেকটিভের হাতেই ছেড়ে দেওয়া ঠিক নয় কি?’

অজিতবাবু বলেন—‘বেশ, ভেবে দেখি।’

—‘আমি আমার ক্ষুদ্রবুদ্ধিতে দুটি কাজ করেছিলাম। তার ফলাফলটা জানিয়ে রাখি। প্রথমত, টেলিফোন ডাইরেক্টরিতে “অবনক্সাস কল” অথবা “গোস্ট-কল” বলে একটা অনুচ্ছেদ আছে, দেখে থাকবেন। ডাইরেক্টরির নির্দেশ অনুসারে আমি ট্র্যাফিক সুপারকে চিঠি লিখি। তাঁরা এ বিষয়ে আদ্যোপান্ত অনুসন্ধান করে দেখেছেন। কোনো সূত্র পাননি। দ্বিতীয়ত, টেলিফোন লাইনটা একবার পরীক্ষা করে দেখা উচিত মনে করেছিলাম। সে ইচ্ছা প্রকাশ করা মাত্র লুটুবাবু একজন মিস্ত্রি ডেকে সমস্ত লাইনটা পরীক্ষা করান। লাইন কেউ ট্যাপ করছে না, বা লাইনে কোনো ফন্ট নেই। তবে মনে রাখবেন, মিস্ত্রি লাগিয়েছিলেন লুটুবাবু, এবং রিপোর্টটাও তাঁরই।’

অজিতবাবু গম্ভীরভাবে বলেন—‘অশেষ ধন্যবাদ। আপনি আমাদের কাজ অনেকটা এগিয়ে রেখেছেন।’

ডাক্তার মৈত্র প্রতিবাদ করেন—‘কিছু না, কিছু না। রায়সাহেবকে আমি আমার বাবার মতো শ্রদ্ধা করি। তাঁকে রক্ষা করবার জন্য আমি সাহায্য করতে সর্বদাই প্রস্তুত।’

*

*

*

রাত্রে সকলে ঘুমিয়ে পড়লে অজিতবাবু, প্রবীরবাবু আর হেবো ডুপ্লিকেট চাবির সাহায্যে এ ঘরে এলেন। প্রবীরবাবু কলকাতায় একটা টেলিফোন বুক করলেন। অল্প পরেই যোগাযোগ হল। কলকাতার সঙ্গে কথাবার্তা বলে বেরিয়ে এলেন ওঁরা।

ক্র্যাডলের ওপর ফোনটা বসানো রইল। রায়সাহেবকে ঘর বদলিয়ে দূরের একখানা ঘরে নিয়ে যাওয়া হল। যাতে টেলিফোন বাজলেও তিনি শুনতে না পান। রাত্রে আর কিছু হল না। সকালে একটা টেলিফোন এল। হেবো ধরল। না, কোনোও ভূতের গলা নয়। ডাক্তার মৈত্র টেলিফোনে জানতে চাইলেন, রায়সাহেব কেমন আছেন। হেবো জানায়, ভাল আছেন, ঘুমোচ্ছেন। অশ্চর্য, টেলিফোনে আর কোনো রিভ্রাট হল না! এখানে ওখানে অকারণে চার-পাঁচবার টেলিফোন করা হল। ঠিকমতোই কথা বলা গেল। ও-প্রান্ত থেকে কোনো ভূতুড়ে গলা শোনা গেল না। না কোনো রায়সাহেব, না কোনো বাহাদুর। প্রবীরবাবু তাঁর পরিচিত একজন টেলিফোন মিস্ত্রিকে দিয়ে টেলিফোন লাইনটা পরীক্ষা করালেন। না, কোনো গণ্ডগোল নেই লাইনে। কেউ ট্যাপ করছে না।

রায়সাহেব ক্রমশ সুস্থ হয়ে উঠছেন। আরও তিন-চারদিন প্রবীরবাবু থেকে গেলেন, যদিও প্রায় প্রতিদিনই লুটুবাবু তাঁকে প্রশ্ন করেছিলেন—‘কী, আপনার পলাশপুরে কাজ মিটল?’

আর কোনো গণ্ডগোল হচ্ছে না দেখে প্রবীরবাবু ফিরে যাওয়াই স্থির করলেন। অজিতেন্দ্রবাবুকে ডেকে বলেন—‘আমার মনে হয় রায়সাহেব যা বলেছিলেন তা হয় মিথ্যা, না হয় তাঁর কল্পনা। ইচ্ছা করে বুড়োমানুষ মিথ্যা কথা বলবেন কেন? সুতরাং ধরে নেওয়া যেতে পারে যে, ভয়ে আতঙ্কে তিনি ভুল শুনেছিলেন। এ ছাড়া এ সমস্যার কোনো লজিকাল সমাধান হতে পারে না। এই একমাত্র ব্যাখ্যা।’

অজিতেন্দ্রবাবু বলেন—‘এর চেয়ে ভালো ব্যাখ্যা যখন নেই, তখন তাই মেনে নিতে হবে।’

হেবো বললে—‘কিন্তু ব্যাখ্যা তো স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়! প্রথমত, ভূতের কণ্ঠস্বর দাদু একা শোনেননি, ডাক্তার মৈত্রও শুনেছেন। দ্বিতীয়ত, টেলিফোন ছাড়াও ভূতের দাপাদ্যপি এ বাড়িতে হয়েছে। জানলাগুলো আপনা-আপনি খুলে গিয়েছে, রাত্রে কে বা কারা টিনের চালে হেঁটে বেড়িয়েছে। এ তো সবাই বলছে।’

হঠাৎ পর্দা সরিয়ে ঘরে ঢোকেন লুটুবাবু। ধমকে ওঠেন হেবোকে—‘না হে ছোকরা, ভূতের দাপাদ্যপির কথা সবাই বলছে না। আমিও এ বাড়িতে থাকি, একদিনের তরেও ভূতের কোনো দাপাদ্যপি টের পাইনি এতদিন।’

তারপর অজিতেন্দ্রবাবুর দিকে ফিরে বলেন—‘তবে দিনকয়েক হল ভূতের কিছু উপদ্রব টের পাচ্ছি বটে।’

অজিতেন্দ্রবাবু ঝুঁকে পড়েন সামনের দিকে, বলেন—‘কদিন হল কী দেখছেন?’

—‘দেখছি এই ভূতটিকে। বিস্ময় ভূত। গভীর রাতে এ ছোকরা এ-ঘর ও-ঘর ঘুরে বেড়ায়। আপনাকে অশ্রু মিনতি করছি অজিতবাবু, রোগীর বাড়ি থেকে এ সব ছেলে-ছোকরাদের হটান।’

হেবো বেরিয়ে যান তিনি। উনি ঐ রকমই অদ্ভুত।

সেদিন সন্ধ্যাবেলা ওঁরা তিনজনে ডিসপেন্সারিতে এসে ডাক্তার মৈত্রের সঙ্গে দেখা করলেন। অজিতেন্দ্রবাবু বলেন—‘আমরা এবার ফিরে যাব ভাবছি ডাক্তার মৈত্র। আর তো গণ্ডগোল হচ্ছে না!’

ডাক্তার মৈত্র বলেন—‘এ সঙ্গে রায়সাহেবকেও নিয়ে যান না। কিছুদিন বাইরে থেকে ঘুরে এলে একটা চেঞ্জ হবে।’

লুটুবাবু বললেন, ‘তাতে আমার সায় নেই।’

প্রবীরবাবু বলেন—‘সে কী!’

অজিতেন্দ্রবাবুও জানতে চান, ‘ওঁকে স্থানান্তর করায় আপনার আপত্তির কারণ?’

লুটুবাবু বলেন, ‘চেঞ্জ যদি নিয়ে যাবার দরকার হয় তো সে ব্যবস্থা আমিই করব। এই এঁচোড়ে-পাকা ছোকরাটির সঙ্গে গেলে চেঞ্জ উল্টেমুখোও হতে পারে—ফ্রম ফ্রাইং প্যান টু ফায়ার!’

ওঁরা অসহায়ের মতো দুজনেই ডাক্তার মৈত্রের দিকে তাকালেন।

হেসে ডাক্তার মৈত্র বলেন—‘আমার ইচ্ছা-অনিচ্ছা তো আমার মুখ থেকেই শুনেছেন।’

প্রবীরবাবু গুম মেরে গেলেন।

হেবো বললে—‘টেলিফোনটা সারেন্ডার করলে কেমন হয়?’

ডাক্তার মৈত্র আপত্তি জানিয়ে বলেন—‘আমার তাতে আপত্তি আছে। দুটো কারণে : প্রথমত, লাইন একবার নিজে থেকে কাটিয়ে দিলে দ্বিতীয়বার পাওয়া আজকাল অসম্ভব। দ্বিতীয়ত, তাহলে রায়সাহেব কোনোদিনই নর্মাল হবেন না। টেলিফোনে স্বাভাবিকভাবে ওঁকে যেদিন কথা বলাতে পারব সেদিনই বলব উনি সম্পূর্ণ সেরে উঠেছেন।’

প্রবীরবাবু বলেন—‘তা ঠিক। তবে আমার মনে হয় ভূতের ভয় কেউ ওঁকে জোর করে দেখাচ্ছে না।’

ডাক্তার মৈত্র বলেন—‘আমি কিন্তু আপনার সঙ্গে একমত হতে পারছি না প্রবীরবাবু। আপনারা একজন প্রফেশনাল ডিটেকটিভ নিয়োগ করলেই বোধহয় ভাল করতেন। আমার দৃঢ় বিশ্বাস রায়সাহেবকে কেউ ইচ্ছা করেই ভয় দেখাচ্ছে। “মোটিভ” আর “অপারচুনিটি” বিচার করে আমি আন্দাজও করেছি আসল অপরাধীটি কে। কিন্তু আমার পক্ষে তাঁর নাম উচ্চারণ করা ঠিক নয়। প্রমাণ তো নেই আমার।’

পরদিন প্রবীরবাবু বললেন—‘আর ভূতের খেলা হবে না। আজ আমি ফিরে যাব।’

অজিতেন্দ্রবাবুও আর আপত্তি করতে পারলেন না।

যাবার সময় হেবো প্রবীরবাবুর হাতে একটা বন্ধ খাম এনে দিল। বললে—‘আপনি ~~হলে~~ছেন এ বাড়িতে আর ভূতের খেলা হবে না। আমার বিশ্বাস—শীঘ্রই তা হবে। দিনসাতেকের মধ্যেই আপনাকে আবার ফিরে আসতে হবে এখানে। এই খামের মধ্যে একটা চিঠি রইল। কলকাতা পৌছে চিঠিখানা পড়বেন। আপনাকে যে-দুটি অনুরোধ করেছি দয়া করে সে দুটি রাখবেন।’

প্রবীরবাবু জানতেন যে ছেলোটি ইঁচড়ে-পাকা। ডেঁপো মস্তান একটি! আন্দাজে একবার একটি আফিং-চোরের দিকে আঙুল তুলে দেখিয়েছিল বলে ওর সেই আঙুল ফুলে কলাগাছ হয়েছে। তিনি কোনো কথা না বলে বন্ধ খামটা পকেটে ফেলে কলকাতায় ফিরে গেলেন।

*

*

*

ঘটনাটা ঘটল তার দিনপাঁচেক পরে। বাইরের ঘর থেকে একটা আর্তচিৎকার শুনে বাড়িসুদ্ধ সবাই ছুটে এসে দেখে, রায়সাহেব তাঁর বাইরের ঘরের চেয়ারে অঙ্গান হয়ে পড়ে আছেন। কোলের ওপর পড়ে আছে টেলিফোনটা। বেশ বোঝা গেল দীর্ঘদিন কোনো গণ্ডগোল না হওয়ায় সাহস করে দাদু আজ টেলিফোন করেছিলেন। আর তখনই, হয় মোহন খাপা নয় রায়সাহেব নিবারণ মৌলিক ও-প্রান্ত থেকে টেলিফোনে সাড়া দিয়েছিলেন।

দাদুকে আবার ধরাধরি করে শুইয়ে দেওয়া হল তাঁর বিছানায়। অজিতেন্দ্রবাবু ডাক্তার মৈত্রকে ডাকতে লোক পাঠাচ্ছিলেন। বাধা দিলে হেবো, বললে—‘না মেসো, ডাক্তার মৈত্র নয়, অন্য কোনো ডাক্তার।’

অজিতেন্দ্রবাবু একটু অবাক হয়ে বলেন—‘কেন রে?’

হেবো বললে—‘এ রহস্যের কিনারা হয়ে এল বলে। আপনি বরং অন্য কোনো ডাক্তার ডাকুন।’

লুটুবাবু বলেন—‘বেশ তো, ডাক্তার বোস তো পাশেই থাকেন। তাঁকেই ডাকা যাক।’

ডাক্তার বোস এসে দাদুকে পরীক্ষা করে ওষুধ দিলেন। জানালেন—না, ভয়ের কিছু নেই। তিনি সুস্থ হয়ে উঠবেন ক্রমশ।

ওষুধ দেবার আধ ঘণ্টার মধ্যেই দাদু একটু সুস্থ হয়ে উঠলেন। হেবোর মা তখন হেবোকে আড়ালে ডেকে বলেন—‘হ্যাঁরে হেবো, তোর রহস্যের কিনারা হবার কথা কী বলছিলি তখন?’

মেজদা বলে—‘বাদ দাও মা পাগলটার কথা!’

হেবো বলে—‘আর একটা দিন সবুর কর মা। প্রবীরকাকুকে টেলিগ্রাম করেছে। কাল সকালেই তিনি এসে যাবেন। তখনই জানতে পারবে সবাই।’

সন্ধ্যাবেলাতেই প্রবীরবাবু এলেন। এসেই জড়িয়ে ধরেন হেবোকে। বলেন—‘অদ্ভুত তোমার সত্যায়োষণ! কিন্তু কী করে তুমি বুঝলে সব?’

বিস্মিত হয়ে অজিতেন্দ্রবাবু বলেন—‘কী হল?’

প্রবীরবাবু বলেন—‘সমস্ত রহস্যের কিনারা হয়ে গিয়েছে। আর, তা সম্ভব হয়েছে এই ক্ষুদ্রে গোয়েন্দাটির জন্য। কেমন করে আন্দাজ করেছে তা এখনও জানি না, তবে স্বীকার করব—অদ্ভুত ওর ক্ষমতা।’

হেবোর মা বলেন—‘তার মানে, আর ভূতের গলা টেলিফোনে শোনা যাবে না?’

প্রবীরবাবু বলেন—‘না। কারণ যে ভূত টেলিফোনে ভেসে দেখাতো বর্তমানে সে জেল-হাজতে। সত্যি হেবো, আমি স্বপ্নেও ভাবতে পারিনি যে, এ রহস্যের কিনারা তুমি করতে পারবে। কিন্তু এখন স্বীকার করছি তা তুমি করেছ। কী করে যে করেছ—’।

অজিতেন্দ্রবাবু বাধা দিয়ে বলেন—‘আমি যে কিছুই বুঝতে পারছি না।’

প্রবীরবাবু বলেন—‘দাঁড়ান, বুঝিয়ে বলি। এখান থেকে ফিরে যাবার সময় হেবো আমার হাতে একখানা চিঠি দেয়। বন্ধ খাম, ওপরে আমার নাম লেখা। আমি ভেবেছিলাম এসব ওর ছেলেমানুষি—’।

বাধা দিয়ে হেবো বলে—‘একটা কথা। ডাক্তার মৈত্র এখন কোথায় প্রবীরকাকু?’

—‘থানায়।’

—‘থানায়!’ বিস্মিত হয়ে সবাই প্রশ্ন করে একসঙ্গে—‘কেন?’

—‘সেই কথাই তো বলছি। হেবোর চিঠিখানা আমি কলকাতায় গিয়ে খুলে পড়ি। তাতে হেবো আমাকে দুটি অনুরোধ করেছিল। ওর আফিং-চুরির কেসটা শোনার পর ওকে আর একেবারে উপেক্ষা করতে পারিনি আমি। তাই ওর কথামতো একজন ডিটেকটিভকে পাঠাই এখানকার টেলিফোন এক্সচেঞ্জে। আর বিলেতেও একটা টেলিগ্রাম করি। কাল তার জবাব পেলাম। গত বিশ বছরের ভেতর অতুলকৃষ্ণ মৈত্র নামে কেউ এম. আর. সি. পি. হয়নি। এখানকার টেলিফোন এক্সচেঞ্জ অফিস থেকেও খবর গেল যে, এখানকার একজন অপারেটর ফণী নাগ রায়সাহেবের টেলিফোনে ভূতের খেলা দেখাচ্ছে। ঠিক তার পরেই পেলাম শ্রীমান হেবোর টেলিগ্রাফ। তাই টেলিফোন অপারেটর ফণী নাগ আর ডাক্তার মৈত্র নামে বডি ওয়ারেন্ট করিয়ে এখানে চলে এসেছি। ওঁদের দুজনকে এইমাত্র পুলিশের জিম্মায় পৌঁছে দিয়ে আসছি। কিন্তু হেবো যে কী করে কী করল তা আমি এখনও জানি না।’

হেবো উঠে দাঁড়ায়। দু-হাত হাফ-প্যান্টের দুই পকেটে সৈঁদিয়ে হেসে বলে—‘দেখুন প্রবীরকাকু, আমি আন্দাজে কিছুই করি না। আমার প্রত্যেকটি সিদ্ধান্ত প্রমাণের ওপর প্রতিষ্ঠিত। প্রথমত, ভূত আমি মানি না। সূতরাং এ কারও শয়তানি। এখন ভেবে দেখতে হবে, শয়তানি করার স্বার্থ কার হতে পারে? অর্থাৎ অপরাধীর মোটিভটা কী?’

‘আমি বিশ্লেষণ করলাম—দাদুর এই দীর্ঘদিনের অসুখে কে লাভবান হচ্ছে? উত্তর একটিই। একমাত্র ডাক্তার মৈত্র। আর কারো কোনো লাভ নেই। দাদুর অসুখে একজন মাত্র মানুষ লাভবান হচ্ছেন। ডাক্তার মৈত্র দাদুর জুনিয়র হিসাবে কাজ করছিলেন, দাদু শয্যাশায়ী হয়ে পড়ায় তাঁর সম্পূর্ণ পশারটা তিনি দখল করেছেন। প্রচণ্ড খাটুনি বেড়ে গিয়েছে তাঁর, এ কথাই আমরা বলাবলি করেছি—ভেবে দেখিনি তাঁর রোজগারটাও বেড়ে গিয়েছে প্রচণ্ডভাবে। অথচ সব মূলধন দাদুর। ডিসপেন্সারি দাদুর, আলমারিভরা ওষুধ দাদুর, মাইনে-করা কম্পাউন্ডারগুলি দাদুর, পশারটা দাদুর,—মায় সেদিন তিনি যে অস্মানবদনে বললেন—ডাক্তারী ব্যাগ “আমার” গাড়িতে আছে, সেই “আমার” গাড়িখানাও দাদুর—চলে দাদুর অ্যাকাউন্টে পেন্টেলস্লিপ কেটে! লক্ষ করলে বোঝা যায়—দাদু যতদিন বিছানায় পড়ে থাকবেন, ততদিনই ডাক্তার মৈত্র দু-হাতে টাকা লুটবেন।

‘বেশ, এবার ডাক্তার মৈত্রের চরিত্রটাকে দেখি। উনি নাকি একজন বিলেত-ফেরত এম. আর. সি. পি. ডাক্তার। অথচ প্র্যাকটিস শুরু করলেন একজন মফস্বলের ডাক্তারের জুনিয়র হিসাবে। সত্যি সার্টিফিকেট থাকলে তিনি কি ভাল চাকরি পেতে পারতেন না?’

‘এবার দেখা যাক কেমনতর ডাক্তার উনি। আমি লক্ষ্য করে দেখি, তিনি দাদুকে যখন ইনজেকশন দিলেন তখন দাদু বললেন, “উঃ ইন্ট্রাভেনাস দিলে নাকি? বড্ড লাগল যে!” উত্তরে তিনি বললেন—‘না!’ একটা সাধারণ ইনজেকশনে দাদুর এত ব্যথা লাগল কেন? একজন বিলেত-ফেরত এম. আর. সি. পি. ডাক্তারের হাত এত কাঁচা?’

‘তৃতীয়ত, লক্ষ করে দেখলাম, প্রবীরকাকু আসার পরেই ডাক্তার মৈত্র সতর্ক হয়ে উঠলেন। পাছে আমরা টেলিফোন এক্ষেত্রে ‘অবনশ্বাস কল’-এর কথা জানাই তাই আগে থেকেই তিনি জানিয়ে দিলেন ওটা তিনি ইতিপূর্বেই করে রেখেছেন। সন্দেহটা যাতে অন্য খাতে প্রবাহিত হয় তাই উনি “মোটিভ” আর “অপারচুনিটি”র প্রশঙ্গ এনেছিলেন।’

অজিতেন্দ্রবাবু বলেন, ‘কিন্তু টেলিফোন?’

—‘সেটা তো আরো সোজা। লাইনে যখন গণ্ডগোল নেই—কেউ যখন লাইন ট্যাপ করছে না তখন তালাবন্ধ ঘরে টেলিফোন করলে কে কথা বলতে পারে?—একমাত্র অপারেটর ছাড়া?’

—‘কিন্তু শুধু রায়সাহেব ফোন করলেই গণ্ডগোল হয়, অন্য কেউ করলে হয় না কেন? আর কেউ তো ভূতের সঙ্গে কথা বলেনি কোনো দিন?’

—‘বলেছে। আপনারা ভুলে গিয়েছেন। অথবা ঘটনার পারস্পর্য মন দিয়ে লক্ষ করেননি। ডাক্তার মৈত্র দাদুকে প্রথম দিনই বলেছিলেন যে তিনিও টেলিফোনে ভুতুড়ে কথাবার্তা শুনেছেন। এজন্য ডাক্তার মৈত্রকে আরও বেশি সন্দেহ করতে বাধ্য হয়েছে আমি। কারণ দাদু ছাড়া যে দু-জন লোক টেলিফোনে ভূতবাবাজীবনের সঙ্গে কথা বলেছে তার মধ্যে ডাক্তার মৈত্র একজন।’

প্রবীরবাবু বাধ্য দিয়ে বলেন, ‘দাঁড়াও, দাঁড়াও। কী বললে? দু-জন? আবার কে ভূতের সঙ্গে টেলিফোনে কথা বলেছে?’

—‘আমি বলেছি। মৃত মোহন থাপার সঙ্গে আমারও কক্ষিৎ আলাপচারী হয়েছে টেলিফোনে।’

—‘সে কী! কবে?’

—‘আপনি যে-রাত্রে ডুপ্লিকেট চাবি করিয়ে ঘরে ঢুকলেন, তার পরদিন সকালে। আপনি কলকাতায় ট্রাঙ্ক-কল করলেন। চার-পাঁচটা কল করলেন। তারপর কথাবার্তা শেষ করে চলে গেলেন। সকালবেলা চুপিচুপি আমি ঘরে ঢুকি। আবার টেলিফোন তুলি এবং ডিসপেন্সারির নাম্বার চাই। ফোন ধরে মৃত মোহন থাপা।’

‘কী আশ্চর্য!’ বলেন প্রবীরবাবু।

—‘মোটাই না। আপনারা ঠিক কায়দা করতে পারছিলেন না বলে ভূতের সাক্ষাৎ পাননি। দাদুর সন্তরের কাছাকাছি বয়স—দাঁত পড়ে গিয়েছে। তাই বাবা-মুন্ডাফার মতো কাঁপা-কাঁপা গলায় নাম্বার চাইলাম। ওপাশ থেকে যেই বলল ‘হ্যালো’, অমনি আমি বুড়োটে গলায় বললাম, ‘আমি রায়সাহেব কথা বলছি। তুমি কে? মৈত্র?’ জবাব পেলাম—‘নেহি বড়া সাব। সেলাম! ম্যয় বাহাদুর।’ আত্ননাদ করে উঠলাম—‘কোন সা বাহাদুর?’ ও-প্রান্তবাসী বললে—‘মোহন থাপা বাহাদুর, গরিবপরিবার!’

‘আত্ননাদ করে টেলিফোন রেখে দিলাম। আর তার দশ মিনিটের মধ্যেই অপরাধী চূড়ান্তভাবে ধরা পড়ে গেল!’

—‘দশ মিনিটের মধ্যে! মানে? কেমন করে?’

—‘তার মিনিটদশেক পরেই ডাক্তার মৈত্র টেলিফোন করে জানতে চাইলেন রায়সাহেব কেমন আছেন। আর তৎক্ষণাৎ তিনি চূড়ান্তভাবে ধরা পড়ে গেলেন।’

—‘কেমন করে? এটা তো একটা কোয়েস্টিডেস্‌ও হতে পারত?’

—‘না, পারত না। কারণ ডাক্তার মৈত্র জানেন—আজ দু-মাস ধরে এ বাড়ির বাইরের ঘর তালাবন্ধ। চাবি দাদুর বালিশের তলায় থাকে। আর সবচেয়ে বড় কথা, তিনি জানেন এ ঘরে টেলিফোন ক্র্যাডলে রাখা থাকে না। তাহলে তিনি কোন আক্কেলে অপারেটরের কাছে এ বাড়ির নাম্বার চান? এ বাড়ির টেলিফোন যে স্বস্থানের ওপর রাখা আছে—সে কথা জানতাম আমরা মাত্র তিনজন : প্রবীরকাকু আপনি, মেসোমশাই আর আমি—আর ন্যাচারালি টেলিফোন অপারেটর। ডাক্তার মৈত্র তো সে কথা জানা নয়! তিনি কোন আক্কেলে এ নম্বর চাইলেন? এ নম্বর তো সবসময় এনগেজ্‌ড।’

সিদ্ধান্ত : হয় তিনিই দশ মিনিট আগে ডিসপেন্সারিতে মোহন থাপা সেজেছিলেন, অথবা অপারেটর নিজেই বাহাদুরের পাট্টুকু বলে তারপর ডাক্তার মৈত্রকে টেলিফোন করে জানিয়েছে যে, লাইন আবার ব্যবহার করা হচ্ছে, টেলিফোন ব্র্যাড্লে রাখা আছে।’

*

*

*

দাদু এখন সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে গিয়েছেন। আবার প্র্যাকটিসে বার হচ্ছেন তিনি। ছুটিও ফুরিয়ে এল। হেবোরা এইবার কলকাতায় ফিরবে। যাবার দিন দাদু ওকে কাছে ডেকে নিয়ে বলেন—‘ক্ষুদে গোয়েন্দা। এই ক্যামেরাটা তোমাকে দিলাম। তোমার অদ্ভুত সাফল্যের পুরস্কারস্বরূপ।’

হেবো তো আগেই আনন্দে আটখানা হয়েছিল। ক্যামেরাটা পেয়ে সে একেবারে ষোলোখানা হয়ে গেল। পকেট লাইকা! এন্ট্রুকু একটা ক্যামেরা—এত ছোট যে মুঠোর মধ্যে ধরা যায়। স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের বাঘা-বাঘা গোয়েন্দার দল যা ব্যবহার করে। দাদু বুঝি কয়েক হাজার টাকা খরচ করে সেটা আনিয়েছেন কলকাতা থেকে তাঁর ক্ষুদে গোয়েন্দা-দাদুর জন্য!

তোমরা নিশ্চয় বুঝতে পারছ, এবার যখন ওরা ফিরে এল কলকাতায় তখন হেবোকে দেখে মনে হচ্ছিল পানিপথ থেকে সদ্য ফিরছেন সশ্রীত বাবর শাহ! আর মেজদা? তার মুখখানা দেখে মনে হচ্ছিল—ইব্রাহিম লোদি দি সেকেন্ড! বন্ধুমহলে হেবোর সে কী খাতির! এবারকার ঘটনাটাও সংবাদপত্রের কল্যাণে সকলে আগেই জানতে পেরেছিল।

কলকাতায় ফিরে এসে হেবো দেখে তার নামে আবার একখানা চিঠি এসেছে। খামটা না খুলেও বুঝতে পারে কোথা থেকে এসেছে সেটা। এবার নিশ্চয় উনি হেবোর কৃতিত্বের দুটো প্রশংসার কথা লিখেছেন। অধীর আগ্রহে খামটা খুলে ফেলে হেবো। আর সঙ্গে-সঙ্গে যেন ইলেকট্রিক শক খেল বেচোরা! চিঠিতে লেখা ছিল :

“পলাশপুরের কীর্তিকাহিনী শুনলাম অজিতেন্দ্রর কাছে। তোমাকে বারবার জানিয়েছি অল্প বিদ্যা সম্বল করে কখনো বড় গোয়েন্দা হওয়া যায় না। ভুল হবেই। মনে হয় উপদেশে তোমার শিক্ষা হবে না। ঠেকে শিখতে হবে তোমাকে একদিন। উপায় নেই, তাই-ই তোমার ললাট-লিখন। না হলে এত বড় ছুটিতে তুমি একবারও পড়ার বইগুলো খুললে না কেন? ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি অল্প আঘাতেই যেন তোমার চৈতন্য হয়। ইতি—’

আচ্ছা তোমরাই বল, এত বড় সাফল্যের পর ঐ রকম একটা প্যানপ্যানে পানসে চিঠি পেলে কেমন লাগে? হেবো উন্টে রাগ করে পড়াশুনা একেবারেই ছেড়ে দিল। না, সে পড়বে না। পোপোকাটিপ্যাটেল কোথায়, হিউ-এন-ৎসাঙ কে, আর জিরাভিয়ার ইনফিনিটিভ কাকে বলে না জানলে বড় গোয়েন্দা হওয়া যায় না? সে বিশ্বাস করে না এ কথা। ঐ তো নৃপতি, ওদের ক্লাসের ফার্স্ট বয়, বইয়ের পোকা একটা। সে পারত এ রহস্যের কিনারা করতে?

পড়ার বইয়ের সঙ্গে সব সম্পর্ক হেবো চুকিয়ে দিল একবারে।

তারপর হঠাৎ একদিন ওর মনে হল—উনি কেন লিখলেন, অল্প বিদ্যা সম্বল করে কখন কোনো বড় কাজ করা যায় না, ভুল হবেই। সে কি কিছু ভুল করেছিল? কী ভুল? ওর হঠাৎ মনে হল, তবে কি একা ডাক্তার মৈত্রর কারসাজি ছিল না সেই পলাশপুরের ভূতের খেলায়? কিন্তু আর কার স্বার্থ থাকতে পারে?

বিদ্যুৎচমকের মতো একটা চিন্তা খেলে গেল ওর মাথায়। সব নষ্টের গোড়া কি তাহলে লুটুমামা? দাদুর অবর্তমানে সমস্ত সম্পত্তি আসবে লুটুমামার হাতে। তাই কি তিনি ডাক্তার মৈত্রকে দিয়ে নিজের স্বার্থে এই কাজটা করাচ্ছিলেন? ডাক্তার মৈত্রও কি প্র্যাকটিসটা হাতাবার প্রেরণায় সায দিয়েছিলেন এই ষড়যন্ত্রে? অসম্ভব নয়; অসম্ভব কেন, নিশ্চয় এটা সম্ভব। অথচ শার্লক হেবোর মতো বিচক্ষণ গোয়েন্দা আসল অপরাধীকে না ধরে ধরল তার সহকারীকে? ছি ছি ছি!

সুযোগ এল পূজার ছুটির সময়। হেবো বলে—‘আবার ছুটিতে আমরা পলাশপুরেই যাই। যাবে মা?’

মা বলেন—‘সে কি রে? পলাশপুরে তো এখন ওঁরা কেউ নেই।’

—‘নেই? কেন? তবে দাদু কোথায় আছেন?’

—‘জ্যাঠামশাই শরীর সারাতে দার্জিলিঙ গিয়েছেন।’

‘লাভলি!’—লাফিয়ে ওঠে হেবো, ‘তবে দার্জিলিঙেই চল না!’

অবিনাশবাবু ইতস্তত করছিলেন; কিন্তু পরদিনই ঘটনাচক্রে এল দাদুর একখানা চিঠি। লিখেছেন—‘প্রিয় অবিনাশ, তোমার কলেজের তো এখন ছুটি! আমার দাদুদেরও ছুটি নিশ্চয়। এখানে একা-একা আমার দিন কাটে না। উঁচু-নিচু জায়গায় বেশি হাঁটতেও পারি না। লুটু তো দিবারাত্র শুধু ছবি এঁকে বেড়াচ্ছে। তার দেখাই পাই না। তোমরা সকলে ছুটিটা এখানে কাটিয়ে গেলে খুশি হতাম।’

মেজদা বলে—‘কিন্তু ঐখানটা তো বুঝলাম না মা! লুটুমামা ছবি এঁকে বেড়াচ্ছে মানে?’

হেবো বলে—‘বাঃ, ভুলে গেছিস? লুটুবাবু আর্টিস্ট নয়? ছবি আঁকা আর মডেল গড়া হয়েছে তাঁর নেশা! অন্তত ভেকটা তাই ধরেছেন তিনি।’

মা বলেন—‘ও আবার কী ধরনের কথা! লুটু সত্যিই ভালো ছবি আঁকে।’

হেবো উদাস কণ্ঠে বললে—‘দুঃখ এই যে চক্ষুকর্ণের বিবাদটা এখনও মেটেনি। স্বচক্ষে তাঁর কোনো শিল্পকার্য দেখিনি তো সেবার।’

—‘বাঃ! তখন ঐ অসুখের বাড়িতে—’

মেজদা বাধা দিয়ে বলে—‘আচ্ছা লুটুমামা দাদুর কোন সম্পর্কের ভাগ্নে?’

মা বলেন, ‘ঠিক জানি না। শুনেছি সম্পর্ক কী একটা যেন আছে।’

হেবো মনে মনে বলে—‘তা তো আছেই! যম-জামাইয়ের সম্পর্ক!’

শেষ পর্যন্ত কিন্তু অবিনাশবাবু অথবা হেবোর মায়ের যাওয়া হল না। হেবোর কাকিমার শরীর খারাপ। তাই ওঁরা রয়ে গেলেন। অবিনাশবাবু বলেন—‘তবে জ্যাঠামশাই অত করে লিখেছেন—ছেলেরা বরং যাক।’

আপত্তি করল মেজদা, বলে—‘ওকে নিয়ে যেতে আমার সাহস হয় না। হয় আমি যাই, হেবো থাকুক, অথবা হেবো থাকুক, আমি যাই—’

বাধা দিয়ে মা বলেন—‘না না, হেবো এবার কোনো গণ্ডগোলের মধ্যে থাকবে না।’

বার বার করে তিনি সাবধান করে দিলেন হেবোকে। হেবো স্পিকৃটি নট।

দার্জিলিঙে হেবো যে কাণ্ডটা করেছিল সেই গল্পটা বলেই শেষ করব এ কাহিনী। কিন্তু ঘটনাটা আমি নিজের ভাষায় বলব না। ওর ডায়রির খানকতক পাতা তুলে দেব শুধু। তা থেকেই ঘটনাটা জানতে পারবে তোমরা।

*

*

*

১৭ই সেপ্টেম্বর
ঘুম

মাত্র কাল দার্জিলিঙে এসে পৌঁছেছি। আমার জীবনে এই প্রথম শৈলনগরী দার্জিলিঙ ভ্রমণ। এখানকার প্রাকৃতিক দৃশ্য, কাঞ্চনজঙ্ঘার শোভা বর্ণনা করবার জিনিস বটে; কিন্তু আমার ডায়েরি লেখার উদ্দেশ্য তা নয়। তাই ডায়েরি-পাঠকের কাছে প্রথমেই ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি। আমাকে এই ডায়েরি লিখতে হচ্ছে এজন্যে যে, আমার জীবনে ডাক্তার ওয়াটসনের সাক্ষাৎ আমি এখনও পাইনি। তিনি আবির্ভূত হলেই আমার ছুটি।

দার্জিলিঙে এসেছি আমি আর মেজদা, উঠেছি দাদুর বাড়িতে। আমার দাদু রায়সাহেব নিবারণ মৌলিক জীবনে লব্ধপ্রতিষ্ঠ। কয়েক মাস আগে ভূতের ভয়ে তিনি স্নায়বিক দুর্বল্যে (কথাটা ‘দৌর্বল্যে’, হেবো বানানটা ভুল করেছে) ভুগছিলেন। আত্মশ্লাঘা করব না, কোনো একজন কিশোর গোয়েন্দার বুদ্ধির জোরে তিনি সে রোগ থেকে মুক্ত হয়েছেন; কিন্তু এখনও একেবারে স্বাভাবিক হতে পারেননি।

অল্পেতেই তিনি উদ্বিগ্ন (অর্থাৎ ‘উদ্ভিগ্ন’)—এত বানান ভুল করলে হেবো স্কুল-ফাইনাল পাশ করবে কেমন করে? হয়ে পড়েন। মৃত্যুভয়টা যেন তাঁকে পেয়ে বসেছে!

বাড়িটা ঠিক দার্জিলিঙে নয়—দার্জিলিঙের মাইলকয়েক আগে—বাতাসিয়া ডবল লুপের কাছে, ঘুমে। মস্ত বাড়ি! দাদুর সঙ্গে আছেন ভাগ্নেপ্রবর, অর্থাৎ আমাদের লুটুমামা। আর আছে কিশোর থাপা, মোহন থাপার ছোট ভাই। সব নেপালীর মতো তার চোখ দুটি কুৎকুতে, মাথায় খাটো, আর তার ডাকনাম—সব নেপালীর মতো—বাহাদুর। নটবর দাদুর পলাশপুরের বাড়ির তদারক করছে।

আগেই বলেছি, এখানকার নৈসর্গিক সৌন্দর্য, আসবার পথের বর্ণনা লিখে ভ্রমণ-কাহিনীর পাতা ভরানো চলে—কিন্তু বস্তুতাত্ত্বিক গোয়েন্দার ডায়রিতে সে সব বাহুল্য। আমি এখানে এসেছি একটা বিরাট রহস্যের কিনারা করতে—তার প্রথম পর্ব খতম করে এসেছি পলাশপুরে। শুনেছি ডাক্তার মৈত্র এখন ডোরাকটা হাফ-প্যান্ট পরে, গলায় নম্বর তক্তা বুলিয়ে কপি বুনছেন। এবার নাটের গুরুকে গাঁথে তুলতে পারলেই নিশ্চিন্ত। সেই মহাপ্রভুর সন্ধানই আমার এ অভিযান।

*

*

*

১৮ই সেপ্টেম্বর

ঘুম

লুটুমামাকে যেন চেনাই যায় না! পলাশপুরের সেই ভদ্রলোকটিকে এই লুটুমামার মধ্যে যেন খুঁজেই পাওয়া যায় না। এখন উনি পুরোপুরি আর্টিস্টের ভেক ধরেছেন। আঁকবার সরঞ্জাম নিয়ে রোজই ভোরবেলা উনি বেরিয়ে যান, ফেরেন একেবারে সন্ধ্যা করে। কোন পাহাড়ের ধারে, কোন গাঁয়ের কিনারে, কোন ঝরনার পাশে বসে তিনি ছবি আঁকবেন তা বলে যেতেন শুধু বাহাদুরকে। রোজ দুপুরবেলা বিরাট টিফিন ক্যারিয়ারে করে খাবার, ফ্লাস্কে করে কফি নিয়ে সে খাইয়ে আসে তাঁকে। আমি একদিন ওঁর সঙ্গে ছবি আঁকা দেখতে যেতে চাইলাম—কিন্তু ধমক শুনতে হল পরিবর্তে। আশ্চর্য! ভদ্রলোক যে কী আঁকেন তাও দেখাতে চান না! সন্ধ্যাবেলা ফিরে এসে নিজের ঘরে কাগজমোড়া ক্যানভাসটা রেখে, ঘর তালাবন্ধ করে আবার বেরিয়ে যান। ফেরেন গভীর রাত্রে। লুটুবাবুর চলা-ফেরা রীতিমত সন্দেহজনক। উনি আদৌ ছবি আঁকেন কি? দাদুকে একদিন কথার ছলে জিজ্ঞাসা করলাম তিনি লুটুবাবুর আঁকা কোনো ছবি কখনও দেখেছেন কিনা।

দাদু হেসে বলেন—‘আবার ওর পেছনে লেগেছ? কেন বাপু? তোমরা খাও-দাও ফুটি কর। ওকে নিজের মতো থাকতে দাও।’

আমি মনে মনে হাসি। তা দিলে আমার চলে কেমন করে? দুনিয়ার তাবৎ সন্দেহভাজন ব্যক্তিকে যদি যার-যার নিজের মতো থাকতে দেওয়া যায়, তাহলে শান্তিপ্রিয় মানুষগুলোর দশা কী হবে? আর আশ্চর্য মানুষ ঐ বাহাদুর! সত্যি রক্তমাংসের মানুষ তো ও? ওকে প্রশ্ন করে কোনো জবাব পাওয়ার উপায় নেই। কী ট্রেনিং দিয়ে রেখেছেন ওকে লুটুমামা! লোকটা যেন কথা বলতেই জানে না। লুটুমামা কীসের ছবি আঁকেন জিজ্ঞাসা করলেও উত্তর দেয় না। শুধু মিটিমিটি হাসে। খুদে চোখদুটো একেবারে বুজে যায়।

আমার আরও সন্দেহ হয়, বাহাদুরও এ ষড়যন্ত্রের ভেতর নেই তো! লুটুমামার সহকারী নয় তো সে কোনো পাপের কারবারে?

মেজদাকে একদিন ও সম্বন্ধে একটু ইঙ্গিত দিয়েছিলাম। এমন মাথামোটা গবেট ওটা, বলে—‘নড়েছে?’

অবাক হয়ে বলি—‘নড়েছে মানে? কী?’

—‘পোকা!’

আরও অবাক হয়ে বলি—‘পোকা? কোথায় নড়েছে?’

বলে—‘তোমার মগজে!’

ওর সঙ্গে পরামর্শ করা বৃথা। যার মগজে নিরেট গোবর সে কেন যায় পরের মগজের খবর নিতে!

কদিন আর ডায়রি লিখিনি। কারণ নূতন কোনো কুর সন্ধান পাইনি এখনও। একটা জিনিস অবশ্য লক্ষ করছি—লুটুমামা এ কয়দিন আর আঁকতে বার হচ্ছেন না। দিনের অধিকাংশ সময় তিনি কাটিয়ে দিচ্ছেন নিজের ঘরে, দরজা বন্ধ করে। একেবারে নির্জনে নয় কিন্তু। বাহাদুরও থাকছে ঘরে। ব্যাপারটা রীতিমতো রহস্যজনক। বন্ধ ঘরে কী করছেন ওঁরা দুজনে? মেজদাকে দ্বিতীয়বার বলতে গেলাম কথাটা। মেজদা ধমকে উঠল—‘দ্যাখ হেবো! এইজন্যই তোর সঙ্গে আসতে চাইনি। তোর সঙ্গে এখানে একসঙ্গে থাকা আমার পোষাবে না; হয় তুই থাক আমি ফিরে যাই : না হয় আমিই থেকে যাই, তুই ফিরে যা!’

মাথামেটা গবেট কোথাকার! এত বড় সোজা কথাটা খেয়াল হচ্ছে না গবেটটার? এর মধ্যে সন্দেহজনক কিছু দেখতে পেল না? সে খেয়াল করে দেখল না যে, লুটুমামা একজন শিক্ষিত বাঙালী যুবক, ওদিকে বাহাদুর ভাল করে বাঙলা কথাই বলতে পারে না। দু-জনের শিক্ষায়-দীক্ষায় আশমান-জমিন ফারাক! তাহলে এমন কী বিষয়বস্তু থাকতে পারে যা নিয়ে ওঁরা দু-দিন ধরে রুদ্ধদ্বারকক্ষে আলোচনা করছেন? একে যদি গোপন ষড়যন্ত্র না বলে তবে কাকে বলে?

আজ বিকালে আর সন্দেহ চেপে রাখতে পারলাম না। লুটুমামার ঘরের পেছন দিকের জানলাটা মাটি থেকে ফুটআষ্টেক উঁচুতে, যদিও একতলায় ঘর। পাহাড়ে জায়গায় এর কম হয়েই থাকে। জানলা দিয়ে দেখতে হলে আট ফুট উঁচু একটা মই চাই। কিন্তু মই পাব কোথায়! বাধ্য হয়ে দু-খানা ছোট হাত-আয়না কিনতে হল। দু-খানা কঞ্চির দু-প্রান্তে আয়নাদুটো লাগিয়ে একটা পেরিস্কোপ বানিয়ে ফেললাম। কিন্তু এত প্রচেষ্টা বার্থ হল আমার। পেরিস্কোপটা উঁচু করে ধরতেই হঠাৎ জানলা থেকে বেরিয়ে এল লুটুমামার একখানা হাত। পেরিস্কোপটা টেনে নিল সেই হাত ঘরের ভেতর। পরমুহূর্তেই জানলার পরদাটা সরে গেল।

এবং তার পরেই লুটুমামা নেমে এলেন নিচে। বলেন—‘তোমাকে বলেছি না, আমার পেছনে লেগো না?’

আমি কোনো কথা বলি না।

দাদুর কাছেও কথাটা বলেছেন উনি। দেখলাম, দাদুও বিরক্ত হয়েছেন। তবে নাকি আমি ওঁর প্রাণদাতা, তাই মৃদু ধমক দিয়ে শুধু বললেন—‘লুটুর পেছনে লেগো না। আগেই তোমাকে একবার বারণ করেছি, ও আর্টিস্ট মানুষ, লোকজন পছন্দ করে না।’

আমি নিরীহের মতো বলি—‘আমি তো ওঁকে বিরক্ত করিনি।’

—‘শুনলাম আয়না দিয়ে কী সব যন্ত্র তৈরি করেছ?’

আমি চুপ করে থাকি।

দাদু বিরক্ত হয়ে বলেন—‘এত বড় বাড়ি, খেলবার জায়গার অভাব তো নেই। ওর কাজের খবরদারি না-ই বা করলে।’

রাত্রে দেখি, মেজদা মস্ত চিঠি লিখছে। এদিকে মাথা-ভরা গোবর, ওদিকে চুকলি কাটার যম!

ভগবান এতদিনে মুখ তুলে চেয়েছেন। না হলে মূক বাহাদুর কী করে এমন মুখর হয়ে ওঠে? কাল বিকালে লুটুমামা বেরিয়ে যাবার পর বাহাদুর আমাকে আড়ালে ডেকে নিয়ে গেল। বাতাসিয়া ডবল লুপের দিকে বেড়াতে গেলাম আমরা। নির্জনে এসে বাহাদুর আমাকে খুলে বললে তার সমস্যার কথা। ভাঙা-ভাঙা হিন্দির মধ্য থেকে যে কাহিনীটা উদ্ধার করলাম, তা এই :

বাহাদুরের বাড়ি এই দার্জিলিং পাহাড়েই। গয়াবাড়ি টী এস্টেটে। উত্তরাধিকারসূত্রে সে একটা পাথরের মূর্তি পেয়েছে। কোনো তিব্বতী লামার কাছ থেকে ওর ঠাকুরা এনেছিলেন বুঝি। বাহাদুর সেটাকে নিত্য পূজো করে। লুটুমামার নজর পড়েছে ঐ মূর্তিটার ওপর। তিনি বাহাদুরকে পীড়াপীড়ি

করছেন মূর্তিটা তাঁকে বিক্রি করে দিতে। প্রথমে নগদ পাঁচ টাকা দর দিয়েছিলেন—বাহাদুর আপত্তি করায় দরটা বাড়িয়ে দশ-বিশ-পঁচিশ করতে করতে নগদ একশো টাকা পর্যন্ত উঠেছে! অথচ বাহাদুরের ইচ্ছে নয় দেবমূর্তিকে সে বিক্রয় করে। ওকে গররাজি দেখে লুটুমামা আজ ওকে বলেছেন নগদ দুশো টাকা দেবেন তিনি। বাহাদুর ইতস্তত করছে এখন। দুশো টাকা কম নয়। অথচ ঠাকুরদার আমল থেকে ওদের বংশে মূর্তিটার পূজো হচ্ছে। দেবতাকে বিক্রয় করতেও মন উঠছে না। আজ বাহাদুরের আবার ভয় হয়েছে—লুটুমামা ঐ মূর্তিটা পাওয়ার জন্য যেভাবে ক্ষেপে উঠেছেন, তাতে মনে হয়, সোজাপথে ওটা না পেলে বাঁকা পথের আশ্রয় নিতেও তিনি পিছপাও হবেন না।

বুঝতে পারি, যে-কোনো কারণেই হোক মূর্তিটা অত্যন্ত মূল্যবান। কী হতে পারে? মূর্তিটা দেখতে চাইলাম। বাহাদুর আমাকে নিয়ে গেল তার ঘরে। তখন সন্ধ্যা হয়ে গিয়েছে। কনকনে শীত পড়েছে। ওর ঘরে আমাকে নিয়ে গিয়ে একটা প্রদীপ জ্বালল বাহাদুর। আউট-হাউসে ইলেকট্রিক কানেকশন নেই। প্রদীপের আলোয় ঘরখানা ভালো করে দেখি। ছোট ঘর—একদিকে বাহাদুরের বিছানা পাতা, চৌকির ওপর। চৌকির নিচে আছে কালো রঙের একটা ট্রাঙ্ক। অপর পাশে একটা বাস্ক-মতো কিছু কাপড় দিয়ে ঢাকা। সামনে একটা কাঠের বেদির ওপর বসানো আছে বাহাদুরের দেবমূর্তি। ফুটখানেক উঁচু। শ্বেতপাথর খুদে বানানো। একটা রান্ধস যেন দুহাত উর্ধ্বে তুলে হা-হা করে হাসছে। এ আবার কেমন দেবমূর্তি? যাই হোক মূর্তিটার চোখদুটো দেখবার মত! প্রদীপের আলোয় চোখদুটো জ্বলে উঠল। কী দিয়ে তৈরি চোখদুটো? হীরে নয় তো? না হলে এই সামান্য পাথরের মূর্তিটার জন্য এত দাম দিতে চাইছেন কেন লুটুমামা? পাথরের মূর্তিটা ফাঁপা নয় তো? ওর ভেতরে কোনো নবাবজাদার হারানো কমলমণি হীরে অথবা কোনো মহারানির নেকলেস লুকানো নেই তো? তিব্বতী লামাদের নিয়ে অনেক রহস্যজনক গল্প পড়া আছে। তিব্বতী লামা যে গল্পে ঢুকবে সেই গল্পেই রহস্যজনক একটা কিছুর সন্ধান পাওয়া যাবে। এখানেও নিশ্চয়ই তেমন কিছু আছে।

বাহাদুরকে অত কথা কিছু বললাম না। তাকে শুধু বলি যে, কোনো দামেই যেন সে দেবমূর্তিটা বিক্রয় না করে। তাহলে দেবতার রোষ পড়বে তার ওপর। বাহাদুর বোধহয় আমার কথা বুঝতে পারে। ঘাড়টা নাড়ে বার-দুই। আধবোজা চোখদুটো একেবারে বন্ধ করে কী যেন মন্ত্রপাঠ শুরু করে।

ওর ঘর থেকে বেরিয়েই থমকে দাঁড়িয়ে পড়তে হল আমাকে। অন্ধকারের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছেন লুটুমামা। তাঁর চোখদুটো জ্বলছে ঐ মূর্তিটার মতই। আমাকে দেখে বলেন—‘আবার বাহাদুরের পিছনে লেগেছ?’

আমি বলি—‘আমি তো দেখছি আপনিই আমার পেছনে লেগেছেন।’

—‘বটে! তা এখানে কী মনে করে?’

আমি গম্ভীরভাবে বলি—‘বাহাদুর ঐ মূর্তিটা বিক্রি করবে শুনেছিলাম—তাই দেখতে এসেছি।’

—‘তুমি কিনবে বুঝি? কত দাম জান ওটার?’

—‘জানি, এবং এ-ও জানি আপনি যা আন্দাজ করছেন তার চেয়ে বেশি।’

একটু থতমত খেয়ে যান লুটুমামা। বলেন—‘কত দাম বল তো?’

—‘আমি বাহাদুরকে তিনশো টাকা দাম দিয়েছি।’

একেবারে হকচকিয়ে যান লুটুমামা। আমতা-আমতা করে বলেন—‘অত টাকা তোমার কাছে আছে?’

আমি একটা মোক্ষম চাল চালি। বলি—‘না নেই, তবে আমার জানা খদ্দের আছে, যে ওর চেয়েও বেশি দামে আমার কাছ থেকে ওটা কিনে নেবে।’

অনেকক্ষণ লুটুমামা কোনো জবাব দিলেন না। তারপর গুটিগুটি দাদুর ঘরের দিকে চলে গেলেন।

রাত্রে মেজদা আমাকে ডেকে বললে—‘আর তো পারি না তোর জ্বালায় হেবো! আবার গোয়েন্দাগিরি শুরু করেছিস তুই? দ্যাখ, এভাবে আমার পোষাবে না, হয় আমি থাকি তুই চলে যা—’

তার মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বলি—‘অথবা তুমি থাক আমি চলে যাই, কেমন না? কিছু ভাবতে হবে না মেজদা, তুমি-আমি দু-জনেই থাকব। যেতে হয়, যাবে ঐ কংসমামাই!’

এই অক্টোবর

আজ সকাল থেকে দেখি লুটুমামার ঘর তালাবন্ধ। কেথায় গিয়েছেন তিনি? আমার চোখ এড়িয়ে কিছু হবার জো নেই। একটু সন্ধান নিতেই বুঝতে পারলাম লুটুমামা গিয়ে প্রবেশ করেছেন আউট-হাউসের ঐ খাপরার ঘরখানায়। সকাল তখন আটটা। সমস্ত সকালটা নজরে নজরে রেখেছি তাঁকে। কী আশ্চর্য, উনি যখন ঐ আউট-হাউসের দরজা খুলে বেরিয়ে এলেন তখন সকাল সাড়ে এগারোটা। সাড়ে তিনঘণ্টা ধরে ঐ খাপরার ঘরে দু-জনে মিলে কীসের পরামর্শ করছিলেন লুটুমামা আর বাহাদুর? ওঁর ঘরে কেন যে পরামর্শসভাটা আর বসছে না তা উনিও জানেন, আমিও জানি। কাল বিকালে উনি দেখতে পেয়েছিলেন আমাকে।

পেরিস্কোপের পরীক্ষায় ব্যর্থ হবার পর আমি নিশ্চিত থাকিনি। কাল বিকালে লক্ষ করে দেখলাম, পেছনের পাহাড়ে একটি স্থান আছে যেখানে যেতে পারলে ঐ ঘরের জানলার ভেতর দিয়ে ঘরটা দেখা যাবে। কিন্তু দূরত্বটা বড় বেশি। অন্তত পাঁচশো ফুট তো বটেই। অত দূর থেকে ঘরের ভেতর কী হচ্ছে দেখা যাবে না। তাই ‘গুরুবিদায়’-কেসে পাওয়া বাইনোকুলারটা নিয়ে গিয়েছিলাম সঙ্গে করে। অনেক কায়দা করে হাতে-পায়ে হামাগুড়ি দিয়ে জায়গাটায় পৌঁছে যেই বাইনোকুলার দিয়ে তাক করতে যাব অমনি জানলার পর্দাটা কে যেন টেনে দিল। উনিও কি ঘর থেকে বাইনোকুলার নিয়ে জানলা থেকে লক্ষ্য করছিলেন আমার পর্বতারোহণ?

তা সে যাই হোক, দুপুরবেলা বাহাদুর এসে আমাকে চুপিচুপি খবর দিয়ে গেল লুটুবাবু আজ সন্ধ্যাবেলায় কলকাতা যাচ্ছেন। ভদ্রলোক সম্ভবত বুঝতে পেরেছেন যে, শার্লক হেবোর সতর্ক দৃষ্টি এড়িয়ে বেশি কিছু কায়দা করা যাবে না। সারাটা দুপুর ধরে মামাবাবু বাঁধাছাঁদা করলেন, আমি ভালোমানুষের মতো আড়চোখে শুধু দেখেই গেলাম। কী হতে পারে? যদিও বুঝছি গভীর একটা ষড়যন্ত্র চলেছে লোকচক্ষুর অন্তরালে—তবু ষড়যন্ত্রটা কী জাতীয় যতক্ষণ না বোঝা যাচ্ছে ততক্ষণ প্রতিষেধক প্রয়োগ করি কেমন করে?

লুটুমামা আদৌ ছবি আঁকেন না এটা বুঝতে পেরেছি। এ সত্য প্রমাণের ওপর প্রতিষ্ঠিত। কী প্রমাণ? বলছি। লেখকরা লিখে থাকেন, গায়করা গান শেখেন, চিত্রকররা ছবি আঁকেন, অভিনেতাররা পার্ট মুখস্থ করেন। কেন? লেখা, গান শেখা, ছবি আঁকা বা পার্ট মুখস্থ করা তখনই সার্থক হয়ে ওঠে যখন লেখক-গায়ক-চিত্রকর-অভিনেতাররা সাক্ষাৎ পান সমঝদারের। লেখকের চাই পাঠক, গায়কের শ্রোতা, চিত্রকরের দর্শক এবং অভিনেতার হাউস-ফুল বিজ্ঞপ্তির। লুটুমামা কিন্তু ব্যতিক্রম। তিনি ছবি আঁকেন, কিন্তু কাউকে দেখতে দেবেন না। পাছে আমরা দেখে ফেলি, পাছে আমরা ভালো বলি, প্রশংসা করি। বুকেছি মশাই, এ আপনার স্রেফ ধাঞ্চাবাজি!

তবে কেন অমন ঢং ধরেছেন? রঙ-তুলি-ইজেলের বোঝা নিয়ে কেন এত ভগামি? তাও জানি। যে পাপ-কাজে তিনি হাত দিয়েছেন, তাতে পাহাড়ে-পর্বতে সারাদিন ওঁকে টো-টো করে ঘুরতে হয়। তার জন্য একটা ভড়ং চাই। কী? না—আমি আর্টিস্ট; আমার অন্য কোনো উদ্দেশ্য নেই এভাবে পাহাড়ে-জঙ্গলে ঘুরে বেড়ানোর। তোমরা রোজ-রোজ আমাকে এমনভাবে ঘোরাঘুরি করতে দেখে মনে কোনো সন্দেহ পোষণ করেনো না। কারণ আমি আর্টিস্ট। আমি ছবি আঁকবার জন্যই এ কৃচ্ছসাধন করছি। এটা বোঝা সহজ। তাহলে বাহাদুর সে কথা প্রকাশ করে দেয় না কেন? এর একটিমাত্র জবাব হতে পারে, বাহাদুরও ঐ পাপ কাজের ভাগীদার। না হলে ঐ নিরক্ষর নেপালীটার সঙ্গে অর্গলবদ্ধ ঘরে তিনি তিনদিন ধরে কিসের কনফারেন্স করলেন? কিন্তু বাহাদুর যদি মামার সাক্ষেদী করবে তবে সে মূর্তিটার কথা আমাকে বলে দিল কেন? এরও একটা সম্ভাব্য জবাব আছে। চোরে-চোরে যখন মাসতুতো ভাই তখন নেক-এ নেক-এ ভাব! আবার চোর যখন চোরের ওপর বাটপাড়ি করে তখন সহযোগী চোরের নেক-এ ছুরি চালাতেও দ্বিধা করে না! এইভাবেই লুটুমামা ডাক্তার মৈত্রকে ফাঁসিয়েছিলেন এবং ডাক্তার মৈত্রও লুটুমামাকে ফাঁসাতে চেয়ে ব্যর্থ হয়েছিলেন। পৃথিবীতে যত বড়-বড় ষড়যন্ত্র ফাঁস হয়ে গিয়েছে তাদের মূলেও এই একই কথা।

বাহাদুরকে ডেকে সাবধান করে দিলাম। বললাম, অন্তত আজকের দিনটা সে যেন ঐ রাক্ষস মূর্তিটা সামলে সামলে রাখে। সত্যাত্মবোধী ব্যোমকেশদা একবার একটা মূর্তির ভেতর থেকেই কমলহীরে আবিষ্কার করেছিলেন; হিচককের নর্থ বাই নর্থ-ওয়েস্ট-এও দেখা গিয়েছে মূর্তির ভেতর লুকিয়ে গোপন খবরের ‘টেপ’ পাচার করা যায়। শার্লক হোমসের একটি গল্পে নেপোলিয়ানের মূর্তির ভেতর থেকে রহস্যের সন্ধান পাওয়া গিয়েছিল। এ ক্ষেত্রেও নিশ্চয় এই ধরনের কিছু হচ্ছে। না হলে এই সামান্য মূর্তিটার জন্য লুটুমামা চারশো টাকা দর দেবেন কেন? ওহো, বলতে ভুলে গেছি, আমি তিনশো টাকা দর দেবার পর মামাবাবু নিলামের দর আরও বাড়িয়ে দিয়েছেন। পুরোপুরি চারশো টাকাই দেবেন তিনি। শুরু করেছিলেন পাঁচ টাকা থেকে। বাহাদুরেরও কেমন যেন রোখ চেপে গিয়েছে। সে কিছুতেই বিক্রি করবে না মূর্তিটা। না, চারশো টাকা পেলেও নয়!

বাহাদুরকে বলি, মূর্তিটা যেন আজকে সামলে সামলে রাখে। কারণ আজ অতর্কিতে ওটা চুরি যাবার যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে। দেখলাম বাহাদুরও সেটা আশঙ্কা করেছে। ওর খুদে-খুদে চোখদুটো আরও ছোট হয়ে গেল। বলে—‘চুরি যানে সে—হঁ!’ হাত দিয়ে নিজের গলার কাছে জবাই করার আড়াই-পাঁচি ভান করে। কী সর্বনাশ! শেষকালে খুনোখুনি কাণ্ড হবে নাকি একটা? বিচিত্র নয়! লুটুমামা যদি ওটা অনায়াসভাবে নিয়ে সরে পড়তে চান তবে বাহাদুরের ভোজালিটাও হঠাৎ রক্তপিপাসু হয়ে উঠতে পারে!

কিন্তু সারাদিন যাবার উদ্যোগই করলেন লুটুমামা—গেলেন না। সন্ধ্যাবেলায় দেখি দাদুকে বলছেন—‘একটা কাজ বাকি আছে। আজ রাতে সেটা সরে কাল ভোরের গাড়িতে যাব আমি।’

আমি মনে-মনে হাসি। মনে-মনেই বলি—‘হে সপ্তাৎ কংসমামা! জানি, আপনার কোন মহৎ কর্মটি অসমাপ্ত আছে। বাহাদুরের হীরকখচিত মূর্তিটির অপহরণ-পর্ব! কিন্তু আপনি তো জানেন না শ্রীমান শার্লক হোমসের সতর্ক দৃষ্টি গোকুলে বাড়ছে! শার্লক হোমস থাকতে ওটা অপহৃত হবে না! হতে পারে না!’

তৎক্ষণাৎ খবরটা বাহাদুরকে দিলাম। ওকে খুব সাবধানে থাকতে বললাম আজকের রাত্রিটা।

*

*

*

মজার কথা এই যে, হোমসের ডায়রিতে এর পর মাস দুই-তিন আর কিছু লেখা নেই। আমি তো অবাক! এমন একটা মারাত্মক জায়গায় এসে হঠাৎ ডায়রি লেখা বন্ধ করে দিয়েছিল কেন সে? আমার ভীষণ কৌতূহল হয়েছিল। তোমাদেরও হচ্ছে নিশ্চয়—নয়? শেষ পর্যন্ত ওর মেজদার কাছ থেকে বাকি অংশটা আমি উদ্ধার করেছিলাম :

হেবো লক্ষ্য করল যে, লুটুমামা প্রতিদিনের মতো সেদিন আর সন্ধ্যায় কোথাও বার হলেন না। সকাল-সকাল খাওয়া দাওয়া সরে দরজায় খিল দিলেন। হেবো সতর্ক হয়ে জেগে রইল। ‘ঘুম’-এর দেশের ঘুম ওর চোখে জড়িয়ে ধরছে। হেবো প্রতিজ্ঞা করেছিল এই কালরাতে সে কিছুতেই ঘুমাবে না। ওর ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় যেন ওকে বলে দিচ্ছিল যে শেষরাতে লুটুমামা ঐ রাক্ষস মূর্তিটা অপহরণ করে ভোরের গাড়িতে কলকাতা পালাবেন।

...মেজদা পাশেই লেপ মুড়ি দিয়ে দিবি ঘুমুচ্ছে। কী মজা ওদের! দুনিয়ার যত ঠগ-বদমায়েশ তোমাদের আশেপাশে সর্বনাশের জাল পাতে, আর তোমরা মোমের মতো ভোস-ভোস করে ঘুমোও! আর সর্বনাশ যখন হয়ে যায় তখন সকালবেলা কাঁচা ঘুম ভেঙে উঠে হাউমাউ করে কাঁদতে বস!

এইসব ভাবতে ভাবতে কখন নিদ্রাদেবী এসে হোমসের চোখে পরিয়ে দিলেন ঘুমের কাজল। হঠাৎ ভোর রাতে কিসের আওয়াজে ওর ঘুম ভেঙে গেল। অন্ধকারে শুনলে মেজদার নাক ডাকছে ‘ফং, ফং, ফতুরুরুর!’

ধক করে উঠল হোমসের বুকের মধ্যে—ওদিকেও কি সব ফতুরুর হয়ে গেল নাকি? লাফ দিয়ে উঠে পড়ে হেবো। রেডিয়াম-ডায়াল ঘড়িটায় (যেটা সে আফিং-চোর ধরে প্রাইজ পেয়েছিল) দেখে, ভোর পাঁচটা। অর্থাৎ সকাল হয়ে এল প্রায়। আলনা থেকে সোয়েটার, ওভারকোট, মোজা, মাফলার একে-

একে গায়ে চড়ালো হেবো। তারপর পা টিপে-টিপে বার হয়ে এল ঘর থেকে। মেজদা তখনো ঘুমোচ্ছে অঘোরে। ক্যালকাটা রোডের ওপর দাঁড়িয়ে আছে একটা ট্যাক্সি। পাশেই লুটুবাবুর ঘর। আশ্চর্য! তাঁর দরজা খোলা। অথচ ঘর অন্ধকার। হেবো দরজা ঠেলতেই খুলে গেল সেটা। বাঁ হাতের টর্চটা জ্বালতেই লক্ষ্য হল সুটকেস-বিছানা সব একপাশে গোছানো আছে—অথচ লুটুবাবু নেই। টর্চ নিবিয়ে হেবো বেরিয়ে আসে বাগানে। দ্রুতপদে বাগানটা পার হয়ে এসে পৌছয় বাহাদুরের ঘরে। দরজা বন্ধ। পেছন দিকে গিয়ে দেখে একটা জানলা খোলা আছে। চমকে ওঠে হেবো। এই শীতে কেউ জানলা খুলে শোয়? জানলা দিয়ে ভিতরে একবার উঁকি মেরে দেখতে পারলে হতো! মূর্তিটা যেখানে থাকে সেটা জানলার ভেতর দিয়ে দেখতে পাওয়া উচিত। হেবো একবার স্বচক্ষে দেখে নিশ্চিত হতে চায়। কিন্তু জানলাটা বেশ উঁচুতে। হেবো নাগাল পেল না। পেরিস্কোপটা বেহাত হয়ে গিয়েছে—না হলে এ সময়ে সেটা কাজে দিত। তবে উদ্যোগী পুরুষসিংহের অসাধ্য কাজ নেই। হেবো উঠে পড়ল পাশের কমলালেবু গাছটায়। গাছের নিচের দিকেই একটা ডাল বার হয়েছে। তার ওপর উঠে হেবো উঁকি দিল ঘরের মধ্যে। ভেতরে সূচিভেদ্য অন্ধকার। হেবো টর্চটা জ্বলে ঘরের ভেতর আলো ফেলল—ঠিক যেখানে মূর্তিটা রাখা ছিল!

হঠাৎ এক ঝলক আলোয় হেবো যা দেখল তাতে তার সমস্ত শরীরটা একবার থরথর করে কঁপে ওঠে। হাত থেকে প্রথমেই টর্চটা গেল পড়ে। তারপর ঠক-ঠক-করা হাঁটুদুটো আর হেবোর দেহভার রাখতে পারল না। মাথা ঘুরে সে হুমড়ি খেয়ে পড়ল নিচে।

হেবোর দোষ নেই। ও তো ছেলেমানুষ, বড়রাও কেউ ও দৃশ্য দেখলে অজ্ঞান হয়ে যেতেন। হেবো একঝলক অলোতেই স্পষ্ট দেখে নিয়েছিল—বেদির ওপর মূর্তিটা নেই। তার বদলে ঠিক সেই জায়গায় একটা পেতলের থালায় রাখা আছে বাহাদুরের ছিন্ন মুণ্ড!

একনজর মাত্র দেখেছে সে, কিন্তু ভুল হেবোর হয়নি। হতে পারে না। আদালতে দাঁড়িয়ে হলফ নিয়ে হেবো সনাক্ত করতে পারে যে মুণ্ডটা গয়াবাড়ি টী এস্টেটের কিশোর থাপার। সেই চ্যাপটা নাক, খুদে খুদে চোখ, লার ওপর কাটা দাগ, মাথায় তখনও সেই তার টিপিকাল টুপিটা, আর গলার নিচে ধড় নেই। ঘরের ও প্রান্তে খাটানো মশারির তলা থেকে বাহাদুরের একখানা ঠ্যাঙ বেরিয়ে ছিল। অর্থাৎ ধড়টা চাপা দেওয়া আছে মশারির তলায়। ধড় থেকে মুণ্ডর দূরত্ব—তা অন্তত দশ ফুট!

মিনিট-দুয়েক সময় লাগল উঠে দাঁড়াতে। কিন্তু না, সে ভয় পায়নি। জন্ম-ডিটেকটিভ সে, বাঙলার ভবিষ্যৎ শার্লক হোমস! ভয় পেলে চলবে কেন? তবে ওর জীবনে এটাই প্রথম ফার্স্ট ডিগ্রি মার্ডার কেস তো! কাটা লাশ এর আগে দেখা ছিলনা বলেই হাঁটু দুটো ঐ একটু ইয়ে-মতো হয়ে গিয়েছিল, ভয় পায়নি। হেবো মুহূর্তে কর্তব্য স্থির করে ফেলে। এবার আর জেল নয়, অপরাধীকে ধরতে পারলে তাকে ফাঁসিকাঠে ঝুলতে হবে। ফার্স্ট ডিগ্রি মার্ডার কেস! হত্যাকারী এখনও বাড়িতেই আছে। চকিতের মধ্যে মনে হল, বাড়িতে শক্তসমর্থ লোক কেউ নেই। দাদু বৃদ্ধ, সে ছেলেমানুষ, মেজদাটা ক্যাবলা আর বাহাদুরের ধড়-মুণ্ডর মধ্যে দশ ফুটের ফারাক। সুতরাং হত্যাকারী ভাগ্নেপ্রবরকে বলপ্রয়োগে ধরা যাবে না। না যাক। বল তুচ্ছ, বুদ্ধিই বড়! শার্লক হেবোর বুদ্ধি খুলে গেল চট করে। সবার আগে ঐ ট্যাক্সিটাকে কায়দা করে সরাতে হবে। ওটার সাহায্য না পেলে আততায়ী বেশি দূরে যেতে পারবে না। ওটা ক্যালকাটা রোডে দাঁড়িয়ে আছে—নিশ্চয় লুটুবাবুর অপেক্ষায়।

সদর দরজা খুলে পাহাড়ি ছাগলের মতো লাফাতে লাফাতে হেবো নেমে এল পিচমোড়া কার্ট রোডে। ওদিকে কাঞ্চনজঙ্ঘার মাথায় তখন প্রথম আবিরের প্রলেপ লেগেছে। লাগুক, হেবোর সে সব নজরে পড়ে না। ট্যাক্সি-ড্রাইভারকে বলে—‘আমাকে এক্সুনি ঘুম স্টেশনে নিয়ে চল—’

ড্রাইভার বলে—‘লেকিন উ বাবুকা ক্যা হয়্যা? লাটুবাবু?’

—‘হাঁ হাঁ, ঐ লাটুবাবুই তো আমাকে পাঠালেন; বললেন—‘ঘুম স্টেশন থেকে একগাছা লেণ্ডি নিয়ে আয়। গলায় জড়াবো!’

—‘লেণ্ডি কৌন চীজ? কম্পাটার?’

—‘না সর্দারজী! সে মোম দিয়ে পাকানো মোক্ষম জিনিস! তোমাকে অত ভাবতে হবে না। আমাকে স্টেশনে নিয়ে চল দিকিনি!’

ড্রাইভার ওকে ঐ বাড়ির দরজা খুলে নেমে আসতে দেখেছিল। তাই আর আপত্তি করে না। ঘুম স্টেশনে হেবো আবিষ্কার করল দুজন পুলিশ কনস্টবলকে। হেবো তাদের সবকথা খুলে বলল সংক্ষেপে। যদিও প্রাটফর্মেই ওদের ডিউটি ছিল, তবু মানুষ খুন হয়েছে শুনে ওরা দুজনেই ওর সঙ্গে আসতে রাজি হল। ওদের মধ্যে একজন আবার কিশোর থাপাকে চেনে। পাঁচমিনিটের মধ্যেই হেবোরা ফিরে এল অকুস্থলে। হেবোর নির্দেশমতো সেই কনস্টবলটা উঠল কমলাগাছের ওপর। হেবো ঘরের মধ্যে পাঁচ সেলের টর্চের আলো ফেলতেই ধপ করে পড়ে গেল পুলিশটা। তার মুখে তখন শুধু—‘রাম-রাম-রাম!’

হেবো ধমক দিয়ে ওঠে—‘রাম নাম পরে জপ কোরো। কাটামুণ্ডু দেখেছ?’

—‘জী-হাঁ, রাম-রাম!’

—‘মুণ্ডুটা নেপালীর?’

—‘জী হাঁ, রাম-রাম!’

—‘ওকে চিনতে পারলে?’

—‘জী হাঁ, কিশোর থাপা! রাম রাম!’

—‘ব্যস। তবে এস। হত্যাকারী এখানেই আছে!’

ওরা তিনজনে পা টিপে টিপে এসে দাঁড়াল লুটুবাবুর ঘরের সামনে। হেবো উঁকি মেরে দেখল, দরজার দিকে পেছনে ফিরে লুটুমামা আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে গলায় টাই বাঁধছেন। তাঁর গায়ে একটা সার্জের শাট, নিম্নাঙ্গে শুধু মাত্র আন্ডারওয়্যার। প্রস্থানের প্রস্তুতি। হেবো সন্তুর্ণণে দরজাটা টেনে আলগোছে তুলে দিল শেকলটা। একটা শব্দ হল। লুটুমামা সচকিত হয়ে বলেন—‘কে?’

হেবো বললে—‘কংসমামার যম!’

হুকার দিয়ে ওঠেন লুটুমামা—‘এই হতচ্ছাড়া বোম্বটে বদমায়েশ! দরজা খোল শিগগির!’

হেবো প্রাণ খুলে হাসল। চিল্লাও যত পার! বাঘ এখন বন্দী!

রাম-রাম পুলিশকে দরজায় পাহারায় বসিয়ে হেবো তৎক্ষণাৎ রওনা হয়ে পড়ে থানার উদ্দেশ্যে। যাবার আগে বার-বার করে রাম-রাম পুলিশকে সতর্ক করে যায়—‘থানার দারোগা আসার আগে সে যেন কোনো কারণেই শেকল না খোলে। তাহলে খুনী আসামী পালানোর সম্পূর্ণ দায়িত্ব পড়বে তার ঘাড়েরে। পুলিশটা রাম-নাম জপ করতে করতেই ঘাড় নেড়ে জানায়, নির্দেশটা সম্পূর্ণভাবে হৃদয়ঙ্গম করেছে।

ট্যাক্সি করে থানা-অফিসারকে নিয়ে আসতে সময় লাগল প্রায় আধ ঘণ্টা। ততক্ষণে বেশ সকাল হয়ে গিয়েছে। ওরা এসে দেখে লাঠিটা বাগিয়ে ধরে রাম-রাম অ্যাটেনশন হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। বাড়ির সকলে, মায় আশপাশের বাড়ির অনেকেই গণ্ডগোল শুনে এসে হাজির হয়েছেন। পথ-চলতি লোকও জমে গিয়েছে বেশ। ভেতর থেকে লুটুমামা আপ্রাণ চেল্লাচ্ছেন—‘এ সেই পাঁজি বদমায়েশ বোম্বটেটার কাজ! আমার ট্রেন ফেল হয়ে গেল! মামা তুমি খুলে দাও দরজা!’

দাদুও রাম-রামকে বারে বারে সনির্বন্ধ অনুরোধ করছেন—‘লক্ষ্মী মানিক আমার, এইবার দরজা খুলে দাও’—কিন্তু রাম-রামের তখন অন্য মূর্তি! একে সকাল হয়ে গিয়েছে, তায় লোকজন অনেক এসেছে। আর তার ভূতের ভয় নেই। সে গোঁফে তা দিয়ে শুধু বলছে—‘মাফ কিজিয়ে! বড়া-সাব থানাসে আ রঁহে হেঁ। বিন্ হুকুম মায় কেওয়ারি নেহি খুলুঙ্গা!’

থানা-অফিসার দরজার সামনে এসে দাঁড়ালেন। কোমর থেকে রিভলভার বার করে লুটুমামার উদ্দেশ্যে বললেন—‘আমি এ থানার ও. সি.! আমি দরজা খুলে দিচ্ছি। বেরিয়ে এস। পালাবার চেষ্টা করলে গুলি করব। আমার হাতে পিস্তল।’

দরজা খুলে দেওয়া হল। বেরিয়ে এলেন অসমাপ্ত বেশে লুটুমামা। গোঁফজোড়াটা তাঁর ঝুলে পড়েছে। বলেন—‘এর মানে কী?’

হেবো বললে—‘মানোটা, আপনি ধরা পড়ে গিয়েছেন লুটুবাবু!’

লুটুবাবু চিৎকার করে ওঠেন—‘চোপরাও, বজ্জাত বোম্বটে ছোকা!’

প্রাণথোলা হাসি হাসল হেবো।

দারোগা বলেন—‘আপনাকে এক্ষুনি আমার সঙ্গে থানায় যেতে হবে। অবশ্য ফুলপ্যাটটা পরে নিতে পারেন আপনি।’

লুটুমামার পরনে তখনও সেই সার্জের শার্ট, নীল নেকটাই আর আন্ডারওয়্যার। তিনি বলেন—‘থানায়? কিন্তু কেন?’

—‘আপনাকে খুনের অপরাধে গ্রেপ্তার করছি আমি।’

লুটুমামা চমকে উঠে বলেন—‘খুন? কে করেছে? কাকে খুন করেছে?’

হেবো বলে—‘অভিনয় আপনার নিখুঁত কংসমামা।— কিন্তু ওতে কোনো কাজ হবে না! খুন হয়েছে বাহাদুর—গতকাল রাতে। তার রাক্ষসমূর্তিটাও চুরি গিয়েছে। চুরি ঠিক যায়নি অবশ্য—আপনার জিনিসপত্র সার্চ করলেই সেটা পাওয়া যাবে। আর, কে খুন করেছে জিজ্ঞাসা করেছিলেন? খুনীর নাম, নটোরিয়াস আর্টিস্ট লুটুমামা দ্য গ্রেট।’

লুটুমামার বাক্যস্ফূর্তি হয় না। চোখদুটো যেন কোটির থেকে বেরিয়ে আসতে চাইছে শুধু।

দাদু বললেন—‘কে খুন হয়েছে? বাহাদুর? কিশোর থাপা?’

—‘হ্যাঁ দাদু! নৃশংস হত্যাকাণ্ড! তার কাটা মুণ্ডু পড়ে আছে তার ঘরে!’

ঠিক এই সময়ে একটা বজ্রপাত হল যেন! ঘটনাটা এমন ভয়ঙ্কর যে, স্বয়ং শার্লক হেবোর মতো দুঃসাহসী গোয়েন্দাও স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে পারলনা। তার মাথার মধ্যে টলে উঠল। চোখের ওপর ভেসে উঠল যোজনবিন্দুত ফুলে ভরা সর্বের ক্ষেত।

সংজ্ঞা হারিয়ে কাটা কলাগাছের মতো দাদুর কোলে লুটিয়ে পড়ল হেবো।

*

*

*

গুরুতর ব্যাপারটা হচ্ছে এই যে—ঠিক সেই সময়ে ভিড় ঠেলে এগিয়ে এসেছিল শ্রীমান কিশোর থাপা। তার মুণ্ডুটা ছিল গলাবন্ধ কোটের ওপর স্বস্থানেই। তবে, তার হাতে ধরা ছিল একটা পেতলের থালা এবং তার ওপর কিশোর থাপার দ্বিতীয় আর-একটি মুণ্ডু। রক্ত-মাংসের নয়—মাটির। বিচিত্র হেসে বাহাদুর লুটুমামাকে এই সময় বলে ওঠে—‘হাঁ সাব! মেরা শিরঠো আপ ভুল গয়ে থে! ম্যয় লায়্যা হজোর কো ওয়াস্তে।’

দারোগার প্রশ্নের জবাবে বাহাদুর তার জবানবন্দীতে বলেছিল, গত এক সপ্তাহ ধরে লুটুমামা তাকে সামনে বসিয়ে তার একটা হেড-স্টাডি করছিলেন, কাল রাতে সেটা তিনি নিয়ে আসতে ভুলে যান। আর তার রাক্ষস মূর্তিটা? না, সেটা খোয়া যায়নি। গতকাল রাতে সে সেটা ট্রাঙ্কে তুলে রেখেছিল সাবধানতা অবলম্বন করে। আর মুণ্ডুটা পেতলের থালায় বসিয়ে ও রেখে দিয়েছিল জানলার ধারে।

লুটুবাবু বাহাদুরের ভুলটা শুধরে দেন। বলেন—‘ওটা রাক্ষস-মূর্তি নয় মোটেই—ওটা হচ্ছে লাফিং বুদ্ধ। চীনা ধরনের একরকম বুদ্ধমূর্তি। ভারতীয়, চীনা আর নেপালী ভাস্কর্যের অপূর্ব সংমিশ্রণ আছে ঐ শিল্পনির্দর্শনটিতে।’ তাই তিনি সেটা বাহাদুরের কাছ থেকে কিনতে চেয়েছিলেন। বাহাদুর রাজি না হওয়ায় সেটা আর সম্ভব হয়নি।

দাদু হেবোকে পরীক্ষা করে বললেন—‘শক পেয়ে অজ্ঞান হয়ে গিয়েছে। মূর্ছা ভাঙতে দেরি হবে।’

মেজদা ভয়ে ভয়ে বলে—‘ওষুধ দেবেন না কিছু?’

দাদু বলেন—‘না, ওকে ধরাধরি করে ঘরে নিয়ে যাও। সম্পূর্ণ বিশ্রাম নিতে দাও ওকে। কেউ ওর ঘরে যাবে না।’

বিচক্ষণ ডাক্তার মৌলিক অত্যন্ত বুদ্ধিমান। বুঝেছিলেন, এমন কোনো ওষুধ নেই যাতে বেলা এগারোটা সতেরো মিনিটের আগে হেরোর মূর্ছা ভাঙানো যায়! তাই তিনি ব্যবস্থা করলেন, যেন লুটুবাবু ঐ এগারোটা সতেরোর ট্রেনটা ধরতে পারেন।

*

*

*

পরমশ্রদ্ধাস্পদেষু

আপনার উপদেশে কর্ণপাত করি নাই বলিয়া আমি যৎপরোনাস্তি লজ্জিত। আপনি ঠিকই বলিয়াছেন। শিক্ষা আমার হইয়াছে। প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, ছাত্রজীবনে আর গোয়েন্দাগিরি করিব না। ডিটেকটিভ বই পড়িব না, বাজে সিনেমা দেখিব না।

বাবা, হেডমাস্টারমশাই এবং আপনার এত উপদেশেও যে প্রতিজ্ঞা করি নাই, আজ কেন তাহাই করিতেছি, তাহা জানিতে নিশ্চয় আপনার কৌতূহল হইতেছে। মার্জনা করিবেন—সে লজ্জার কাহিনী আমি বলিতে পারিব না। তবে দেখিবেন—আমার কথার নড়চড় হইবে না।

আশীর্বাদ করুন যেন সত্যরক্ষা করিতে পারি।

ইতি—

আশীর্বাদভিক্ষু

শুধু হেবো

*

*

*

খবর পেয়েছি হেবো তার প্রতিজ্ঞা এ-পর্যন্ত রক্ষা করে চলেছে। ডিটেকটিভ বই দেখলে নাকের ডগাটা আজকাল তার কেমন যেন কুঁচকে যায়—নিষিদ্ধ মাংসের গন্ধে যেমন হয় পরম বৈষ্ণবের! গোয়েন্দাগিরির যাবতীয় সরঞ্জাম সে বাস্তবন্দি করে রেখেছে।

একমনে শুধু পড়াশোনাই সে করছে আজকাল। সামনে স্কুল-ফাইনালের বিরাট কোর্স। সে পরীক্ষায় তাকে স্কলারশিপ পেতেই হবে।

তা হেবো পাবে। এতদিন অবশ্য ফাঁকি দেওয়াতে গোড়াটা কাঁচা রয়ে গিয়েছে। তবু, এত বুদ্ধি ওর, এত খাটছে...পাবে না?

তোমরা কী বল?

নারায়ণ সান্যাল

শালক হেবো

